শিক্ষাব্যবস্থায় ইহসান : প্রয়োজনীয়তা ও পদ্ধতি

-মুফতী কিফায়াতুল্লাহ হাফিযাহুল্লাহ

এক. ইহসান কেন? কার নির্দেশে?

আমরা আল্লাহর সৃষ্টি ও তাঁর দাস। আমাদের জীবনটা তাঁর অবদান ও আমানত। কর্মগুলো তাঁর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য। দাস বা শ্রমিকের কর্তব্য হলো, দায়িত্বগুলো সঠিকভাবে, উত্তমরূপে ও উৎকৃষ্টমানে আদায় করা। এই উত্তমরূপে আদায়ের নামই ইহসান। তাই প্রতিটি কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা তার বান্দার উপর ইহসানকে বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন। হাদীসে এসেছে, রাসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

إن الله كتب الإحسان على كل شيء

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক কাজে ইহসানকে আবশ্যক করেছেন। [সহীহ মুসলিম: ১৯৫৫]

কুরআন হাদীসে ইহসানের কথা বারবার এসেছে। যেন বান্দা তার প্রতিটি কর্মে যত্নশীল হয় এবং তা সুচারুরূপে সম্পাদন করে। এবং কর্মের সুন্দর ফলাফল প্রকাশ পায়। এই সুন্দর ফলাফলের উপর নির্ভর করে আমাদের জীবন, আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও আখেরাতের অফুরন্ত পুরষ্কার।

যে কোনো কাজ ইহসানের সাথে সম্পাদন করলে আল্লাহ তাআলা তার সঙ্গী হয়ে যান। ইরশাদ হয়েছে,

وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ (سورة العنكبوت 69)

আর আল্লাহ তাআলা কোন কাজে বান্দার সঙ্গী হওয়া মানে হলো, আল্লাহ তাআলা সে কাজে তাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেন, যেন কাজটি পূর্ণতা লাভ করে, নিখুত

হয়, সে কাজের লক্ষ্য উদ্দেশ্য পূর্ণমাত্রায় অর্জিত হয় এবং সে কাজের সুফল পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়।

দুই. ইহসান কীভাবে? কী উদ্দেশ্যে?

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না, যে কোন কাজ উত্তমরূপে সম্পাদন করার জন্য সে কাজের নিয়মতান্ত্রিকতা রক্ষা ও সকল উৎকৃষ্ট উপাদান ও উপকরণগুলোকে সঠিক পরিমাণে যোগান ও যত্নসহকারে সমন্বয় করা জরুরী। উদাহরণস্বরূপ, ভালো একটি পাকের জন্য (যেমন: একটি সুস্বাদু বিরিয়ানীর জন্য) যে সকল উপাদান, উপকরণ প্রয়োজন তার সবগুলো যোগান দেয়া জরুরী। অতঃপর প্রত্যেকটির সঠিক পরিমাণ নির্ধারণ করে পাক-প্রণালী অনুসরণ করে সময় অনুপাতে সমন্বয় করাও জরুরী। অতঃপর তা সঠিক পাত্রে চুলার উপর রেখে সঠিক মাত্রায় আগুনে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাপ দেয়া জরুরী।

এর মাঝে কোন একটি উপাদান যেমন লবন, তেল, মরিচ বা যে কোন মশলা যদি বেশকম হয়ে যায় বা কোনো কারণে শুধুমাত্র আগুনের তাপমাত্রাও যদি বেশকম হয়ে যায় তাহলে বাকী সব আয়োজন বরবাদ। আর যদি একাধিক উপাদান বেশকম হয় তাহলে তো সর্বনাশ।

এভাবে আমাদের প্রতিটি কর্মের জন্যও রয়েছে উপাদান, উপকরণ ও নিয়মনীতি। কর্ম সম্পাদনের সময় যেগুলোর প্রতি খেয়াল রাখা জরুরী। সে কর্মের লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য, উদ্দেশ্য পূরণের জন্য। এ সম্পর্কে কুরআন-হাদীসে বিশদ বর্ণনা রয়েছে। ইবাদাত, আদাত, মুআমালাত, মুআশারাত অধ্যায়ের প্রত্যেক আমলের বর্ণনা দেখলেই বিষয়টি পরিস্কার হয়ে যায়। (শুধু জবাইয়ের ইহসান সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত হাদিসটি খেয়াল করলেও যথেষ্ট। যেখানে জবাই—কর্মের ইহসানের জন্য জবাইয়ের আগে ছুড়ি ধার দেয়াসহ বিভিন্ন বিষয়ে খেয়াল রাখতে বলা হয়েছে।)

আমরা পূর্বের আলোচনায় কিছুটা খুলে এ বিষয়টি আলোচনা করেছি।

তিন. ইহসানের এত গুরুত্ব কেন?

ইহসানের সাথে প্রত্যেকটি কাজ সম্পাদনের উদ্দেশ্য হলো, কর্মের সেই লক্ষ্য অর্জন করা, যা প্রতিটি কর্মের পেছনে নিহিত থাকে। যেমন : পাকের উদ্দেশ্য হলো, সুস্বাদু খাবার। চাষের উদ্দেশ্য হলো, উৎকৃষ্ট ফসল। ব্যবসার উদ্দেশ্য, লাভ। দ্বীনী শিক্ষার উদ্দেশ্যে, যোগ্য আলেম তৈরি করা।

যদি এসব কাজ তার সকল উপাদান ও উপকরণ সংগ্রহ করে নিয়মানুযায়ী সঠিকভাবে, উৎকৃষ্টরূপে সম্পাদন করা না হয়, তাহলে উদ্দেশ্য তো পূরণ হবেই না বরং এর পেছনে যে অর্থ, শ্রম, মেধা ব্যয় হবে তাও বৃথা যাবে। বরং আমরা যদি একটু সামনের দিকে দৃষ্টি দিই, এর পরিণাম নিয়ে ভাবি, তাহলে এর পরিণাম যে কত ভয়াবহ তা আমাদের সামনে ভেসে উঠবে।

ধরুন, একজন লোক, যার পরিবার তার কর্মের উপর নির্ভরশীল। ব্যবসা, চাষ বা বাগান দিয়ে তার সংসার চলে। তার অবহেলা শুধু তার জীবন ধ্বংস করবে তাই নয় বরং তার পুরো পরিবারের জীবনকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিবে।

আর শিক্ষাক্ষেত্রে অবহেলা আরও মারাত্মক পরিণাম ডেকে আনবে। শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিবে। পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যত ধ্বংস করে দিবে। শুধু এটুকুতেই শেষ নয়, ধীরে ধীরে যোগ্য আলেম তৈরির পথ বন্ধ হয়ে যাবে। মানুষ অযোগ্যদেরকে নিজেদের রাহবার হিসেবে গ্রহণ করবে। আর তারা তাদের দ্বীন বরবাদ করে দিবে। যেমনটি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رءوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.

(সহীহ বুখারী : ১০০)

তাই প্রত্যেকটি কাজ ইহসানের সাথে, যত্নসহকারে, নিখুতভাবে সম্পাদন করা জরুরি। এর কোন বিকল্প নেই। ইহসানের বিধান না মেনে কোন উপায় নেই। বরং যে কাজ যতবেশী গুরুত্বপূর্ণ সে কাজে ইহসান ততবেশী আবশ্যকীয়। তার মাঝে শিক্ষাব্যবস্থা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যা একটি জাতির মেরুদন্ড, ইসলামের মেরুদন্ড। যে ইসলাম মানুষকে দান করে সর্বোচ্চ জ্ঞান। যার প্রথম বাণীই হচ্ছে:

ٱقۡرَأۡ بِٱسۡمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ

(সূরা আলাক : 1)

প্রতিটি ক্ষেত্রে ইহসান, প্রতি কর্মে ইহসান ইসলামের মহান শিক্ষা। অথচ আমরা অনেক মুসলমান বরং অনেক ইলমের দাবীদার এর প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপই করি না। তবে অনেকেই পার্থিব কিছু কিছু ক্ষেত্রে এর প্রতি খেয়াল রাখলেও তা ইসলামের শিক্ষা, নবীর আদর্শ হিসেবে না এবং সর্বক্ষেত্রে না। আর শিক্ষাক্ষেত্রে তো মোটেই না। অথচ সেটিই ছিল ইহসানের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। বিষয়টি কতই না পরিতাপের! কত না দুঃখজনক!

চার. নিখুত সৃষ্টির লক্ষ্য অর্জনে নিখুত কর্ম আবশ্যক

এখানে আরেকটি বিষয়ের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। যেন কুরআন ও হাদীসে ইহসানের কথা বারবার কেন বলা হয়েছে সে বিষয়টি আমাদের সামনে আরও পরিস্কার হয়। এবং আমরা যেন আরও বেশী যত্নশীল হই।

মূল কথাটি বলার আগে একটি উদাহরণ পেশ করছি, যেন মূল কথাটি সহজে বুঝে আসে।

আমরা দেখি, বড়রা বড়দের কাজগুলো উত্তমরূপে সম্পাদন করে ছোটদের হাতে অর্পণ করার সময় বলেন যে, এবার তুমি তোমার কাজটি সুন্দরভাবে শেষ করো। সাবধান, অবহেলা করবে না। তাহলে আমার সব বরবাদ হয়ে যাবে। তাই বাজার থেকে ভালো মাছ নিয়ে এসে বলে, যত্ন নিয়ে ভালোভাবে পাক করবে। যেন সুস্বাদু হয়, মজা করে খেতে পারি।

অনেক টাকা খরচ করে বিদেশ থেকে উন্নতমানের চারা নিয়ে এসে মালিক কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে বলে, খুব সাবধানে রোপন করবে এবং খুব যত্ন সহকারে পরিচর্যা করবে। যেন সুন্দর একটি বাগান তোমরা আমাকে উপহার দিতে পার। যে বাগান থেকে আমার অনেক লাভ আসবে। না হয় আমার বড় ক্ষতি হয়ে যাবে। কারণ, চারাগুলো সংগ্রহ করতে আমার অনেক কষ্ট করতে হয়েছে এবং অনেক টাকা খরচ হয়েছে।

তাই যাদের হাতে কাজগুলো অর্পণ করা হবে তাদের কি কর্তব্য হবে না যত্ন সহকারে কাজগুলো সম্পাদন করা? যেন তাদের উপরস্থদের আশা পূর্ণ হয়। এবং তারা তাদের কাছে প্রশংসিত ও পুরস্কৃত হয়!

আর যদি তাদের অবহেলার কারণে পূর্বের সকল আয়োজন বরবাদ হয়ে যায় তাহলে তারা কি ভৎর্সনা ও শাস্তির উপযুক্ত হবে না?! নিশ্চয়ই, এটা খুবই সাধারণ কথা।

এবার মূল কথায় আসি। একটু ভাবার আবেদন করি। একটু ভেবে দেখুন, আল্লাহ পাক আমাদের হাতে যে কর্মগুলো ন্যাস্ত করেছেন এগুলোর পিছনে রয়েছে বিশাল আয়োজন। একটি সরিষা দানার পিছনে, এক ফোটা পানির পিছনে ব্যবহৃত হচ্ছে মহাজগত। চন্দ্র–সূর্য, গ্রহ–নক্ষত্র থেকে নিয়ে মহাবিশ্বের সবকিছু। বাস্তবতার সাথে সাথে কুরআন তাই বলে। শত শত আয়াত রয়েছে এ বিষয়ে (যদি মন চায় বিজ্ঞানীদের জিজ্ঞাসা করে দেখুন)।

আয়োজনকারী হলেন মহান, মহিয়ান প্রভু দয়াময়। কর্মগুলোর পিছনে রয়েছে মহাজগতের মধ্যমণি, আশরাফুল মাখলুকাতের জীবন ধারণ, প্রভুর দাসত্ব করে তার সন্তুষ্টি অর্জন, ইহ–পরকালের মুক্তি, সুখশান্তি, সমৃদ্ধি।

এই কর্মে যদি অবহেলা করা হয় তাহলে মহাবিশ্বের যে বিশাল আয়োজন তার কি সর্বনাশ হবে না?! মহান আয়োজনকারী কি নারাজ হবেন না?! এই উদাসীন মূর্খ কর্মীসহ গোটা মানবজাতি কি ক্ষতিগ্রস্ত হবে না?! যে কাজ যত বড় হবে তার ক্ষতির পরিমাণও ততই বড় হবে। তা কি আর বলার অপেক্ষা রাখে!

তাহলে এবার ভাবনার জগত থেকে একদম বাস্তব জীবনের কর্মগুলো নিয়ে ভাবুন। ব্যক্তিজীবন থেকে জাতীয়জীবন পর্যন্ত ছোট-বড় দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো নিয়ে ভাবুন। কোথায় কোন অবহেলা কী পরিণাম ও বিপর্যয় ডেকে আনবে তা বুঝার জন্য অনেক বড় দার্শনিক হতে হবে না।

আমাদের জাতীয় কর্মগুলোর কথা একটু ভাবুন। রাস্তাঘাট নির্মাণ, যান-চলাচলব্যবস্থা, বিদ্যুৎ উৎপাদন, সামরিক প্রশিক্ষণ বা সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্র এবং তার

পরিচালনার দায়িত্ব; সর্বোপরি রাষ্ট্র পরিচালনা সংক্রান্ত আরও অন্য কর্মসমূহ যদি সঠিকভাবে ইহসানের সাথে সম্পাদন করা না হয় তাহলে আমাদের কী পরিণাম হবে? ইহসান থেকে যত দূরে যেতে থাকবে আমাদের অবস্থা তত খারাপ হতে থাকবে। আর তাই হচ্ছে।

আর আইন আদালতে আদল ও ইহসানের অভাব (ন্যায়বিচার, সুবিচারের অনুপস্থিতি) মানুষকে নিমজ্জিত করছে খুন–খারাবিতে। অথচ এই মহা জগতের সকল আয়োজন ছিল তারই রক্ষার জন্য। তাই আয়োজনকারীর দৃষ্টিতে একটি খুন মহাজগত ধ্বংসের চেয়েও জঘন্য।

لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم

(সুনানে নাসাঈ : ৩৯৮৮ সুনানে তিরমিযী : ১৩৯৫)

কারণ, মহাজগতের সকল আয়োজন তো তার জন্যই। সেই যদি খুন হয় তাহলে এ জগতের প্রয়োজন কী? আর কীসের জন্য এ জগত?

মূলকথায় ফিরে আসি। আল্লাহ পাক আমাদের জন্য যত আয়োজন করেছেন তার প্রত্যেকটি তিনি অত্যন্ত নৈপুণ্যের সাথে নিখুঁতভাবে করেছেন। এবং সে সৃষ্টি-নৈপুণ্যতার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন অনেক আয়াতে। নিম্নে শুধু দুটি আয়াত পেশ করা হল।

مَا تَرَىٰ فِي خَلۡقِ ٱلرَّحۡمَٰنِ مِن تَفَٰوُتٖۖ فَٱرۡجِعِ ٱلۡبَصَرَ هَلۡ تَرَىٰ مِن فُطُورٖ ثُمَّ ٱرۡجِعِ ٱلۡبَصَرَ كَرَّتَيۡنِ يَنقَلِبۡ إِلَيۡكَ ٱلۡبَصَرُ خَاسِئٗا وَهُوَ حَسِيرٞ (سورة الملك 3 4)

صُنۡعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِيٓ أَتۡقَنَ كُلَّ شَيۡءٍۚ (سورة النمل 88)

দেখুন না! ফলগুলো কত যে বাহারি রঙে রঙিন। রকমারি স্বাদে ভরা। পাতাগুলোইতো নয়ন জুড়িয়ে দেয়। মনমাতানো ঘ্রাণের কথা কি বলে শেষ করা যাবে? দেখুন তো তাকিয়ে টিয়া, ময়না, দোয়েল, ময়ূর কাকাতুয়ার দিকে। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ–নক্ষত্র– মহাজগত। ছোট–বড় প্রত্যেকটি সৃষ্টি কত নিখুঁত ও অনিন্দ্য সুন্দর।

তাই তিনি পছন্দ করেন তাঁর বান্দাও তাঁর খলিফা হিসেবে তার উপর অর্পিত দায়িত্বের প্রত্যেকটি কর্ম নিখুঁতভাবে সম্পাদন করুক। এবং তার সুফল সেও ভোগ করুক এবং তার সমাজ ও জাতি ভোগ করুক। এ দৃষ্টিভঙ্গিই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাধিক হাদীসে ব্যক্ত করেছেন-

إن الله كتب الإحسان على كل شيء (رواه مسلم: 1955)

إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه (رواه البيهقي في شعب الإيمان : 4931)

বি: দ্র: উপর্যুক্ত আয়াত ও হাদীসের মর্ম বা রহস্য হলো, আল্লাহ তাআলার উত্তম গুণাবলীকে সামনে এনে বান্দাকে উত্তম গুণে গুণান্বিত হতে উদ্‌বুদ্ধ করা। অন্যান্য ক্ষেত্রেও এভাবে উদ্‌বুদ্ধ করতে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যেমন:

إن الله جميل يحب الجمال. (رواه مسلم : 91)

إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا .(رواه مسلم 1015)

الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. (رواه أبو داود : 4941 والترمذي : 1924)

মোটকথা মহান প্রভুর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ও প্রিয়পাত্র হওয়ায় তার উচিত সে যেন তার প্রভুর মত পাক-পবিত্র ও উত্তম গুণাবলীর অধিকারী হওয়ার চেষ্টা করে।

পাঁচ. তালীম বা শিক্ষাব্যবস্থায় ইহসান

যেমনটি পূর্বেও বলা হয়েছে যে, ইহসান ও ইতকানের ক্ষেত্রগুলোর মাঝে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো শিক্ষাক্ষেত্র। বিশেষত দ্বীনী শিক্ষা। বিশেষ করে আলেম—উলামা ও সমাজের কর্ণধারদের জন্য এ শিক্ষাই হচ্ছে জগতের রূহ ও আত্মা। কুরআন ও হাদীসে বারবার এটি ঘোষিত হয়েছে। একটি আয়াত হলো এই-

وَكَذَٰلِكَ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ رُوحٗا مِّنۡ أَمۡرِنَاۚ مَا كُنتَ تَدۡرِي مَا ٱلۡكِتَٰبُ وَلَا ٱلۡإِيمَٰنُ وَلَٰكِن جَعَلۡنَٰهُ نُورٗا نَّهۡدِي بِهِۦ مَن نَّشَآءُ مِنۡ عِبَادِنَاۚ وَإِنَّكَ لَتَهۡدِيٓ إِلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٖ 52 صِرَٰطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۗ أَلَآ إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلۡأُمُورُ ۝ (سورة الشورى 5253)

এ শিক্ষাব্যবস্থা যদি অবহেলার শিকার হয় তাহলে ধীরে ধীরে সবই শেষ হয়ে যাবে। তাই এ শিক্ষাব্যবস্থাকে রক্ষা করার জন্য এবং একে ইহসান ও ইতকানের স্তরে পৌঁছানোর জন্য জীবনবাজি রেখে চেষ্টা করা কর্তব্য।

এই দীর্ঘ আলোচনার উদ্দেশ্য কুরআন ও হাদীসের আলোকে শিক্ষাব্যবস্থায় ইহসানের গুরুত্বকে ফুটিয়ে তোলা। এর প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। এবার শুরু করা যাক শিক্ষাব্যবস্থায় ইহসানের রূপরেখার বর্ণনা।

শিক্ষাব্যবস্থাকে ফলপ্রসূ করার জন্য অন্যান্য ক্ষেত্রের মত এখানেও ইহসান রক্ষা করা জরুরী। আর এখানে ইহসানের স্তরে পৌঁছার জন্য পাড়ি দিতে হবে অনেকগুলো ধাপ। প্রতিটি ধাপেই রয়েছে একাধিক উপাদান, উপকরণ ও তা প্রয়োগের নিয়মনীতি। সেগুলোর সমন্বয়েই পূর্ণ হবে প্রতিটি ধাপের ইহসান। এভাবে ইহসানের সাথে ধাপগুলো পাড়ি দিলেই শিক্ষাব্যবস্থায় ইহসানের স্তরে পৌঁছা সম্ভব হবে। অন্যথায় তা সম্ভব হবে না। আর ইহসানের স্তরে না পৌঁছলে শিক্ষাব্যবস্থা ফলপ্রসূ হবে না।

সবকিছু নিয়ে এখানে সবিস্তারে আলোচনা করা সম্ভব নয়। সংক্ষিপ্ত আকারে কিছু জরুরী বিষয় তুলে ধরার চেষ্টা করব। শুধু লেখা এবং পড়ার সুবিধার জন্য একটি ধারাবাহিকতা তৈরী করেছি। বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোনটা আগে, কোনটা পরে হবে সে দিক বিবেচনা করে নয়।

ছয়. দৈহিক ও মনস্তাত্ত্বিক সাহায্য : আদর-সোহাগ

ক. ইলম পিপাসু তালিবুল ইলম ভাইদেরকে ইকরাম করা, মহব্বত করা, তাদের থাকা-খাওয়ার সুন্দর ব্যবস্থা করা, ইলমের আসবাবপত্র মওজুদ রাখা। তাদেরকে নিজ সন্তানের মত যত্ন করা। এবং এক্ষেত্রে ইহসানের সকল দাবী পূরণ করা। হাদীস শরীফে তাদের যত্নের ব্যাপারে বিশেষভাবে তাগিদ এসেছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

سَيَأْتِيكُمْ أَقْوَامٌ يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَقُولُوا لَهُمْ: مَرْحَبًا مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَاقْنُوهُمْ (رواه ابن ماجه 247)

মুসলিম ইতিহাসেও রয়েছে তাদের যত্ন ও ইকরামের বহু উজ্জল দৃষ্টান্ত।

সাত. আত্মিক যত্ন বা রুহানী খোরাকের সুব্যবস্থা

খ. তাদের জন্য যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া। এরও বিশদ ব্যাখ্যা রয়েছে। তবে সংক্ষিপ্ত কথা হলো, শিক্ষক যোগ্য হলে পড়াবেন, নয়তো পড়ানো থেকে বিরত থাকবেন।

যদি কেউ অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও দরস প্রদানের দুঃসাহস দেখায় তা হবে জঘন্য ও নিকৃষ্ট অপরাধ। এটি পরোক্ষ খুনের শামিল, যার ফলে শিক্ষার্থির যোগ্যতার মৃত্যু হয়। তার আত্মার মৃত্যু হয়, যা দৈহিক মৃত্যুর সমতুল্য। আর এই খুন প্রত্যক্ষ খুনের চেয়ে কোন অংশে কম নয়।

এক্ষেত্রে মাদ্রাসা কতৃর্পক্ষের ইহসান যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া, অযোগ্যদের নিয়োগ না দেওয়া।

যোগ্য শিক্ষকও পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে পাঠদান করবেন। পাঠদানেরও কিছু আদাব রয়েছে, যার মাধ্যমে তা পূর্ণাঙ্গ হয়। তুরুকুত তালীম বা পাঠদান পদ্ধতি সংক্রান্ত কিতাবাদিতে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

৮. কথোপকথন ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে উজ্জীবিত করা

গ. শিক্ষার্থীদেরকে কথা বলা ও জিজ্ঞাসা করার সুযোগ দিতে হবে। এতে শিক্ষার্থীরা উজ্জীবিত হবে। শিক্ষকের সাথে তাদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হবে। লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে, মনোযোগ বাড়বে। তাছাড়া অনেক সময় তাদের অনেকের পড়া বুঝে আসবে না বা উল্টো বুঝবে। যা শিক্ষকের নিকট প্রশ্ন করে বুঝে নিতে হবে। তাদের প্রশ্ন শিশুদের কান্নার মত আর শিক্ষকের উত্তর মায়ের দুধের মত। তাই তাদেরকে প্রশ্ন করার সুযোগ দিতে হবে। না হয় তাদের শিক্ষাজীবনের মৃত্যু ঘটবে।

তাছাড়া কোন শিক্ষকেরও বেখেয়ালে তাসামুহ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বড় বড় ইমামগণেরও তাসামুহ হয়েছে। যদিও তা অন্য স্তরের, ভিন্ন ধরণের। কিন্তু হয়েছে। তাঁরা প্রথমে একটি কথা বলেছেন। পরবর্তী সময়ে নিজের শাগরিদ ও সঙ্গীদের সাথে কথা বলে প্রথম মত থেকে ফিরে এসেছেন। তাসামুহ হওয়াটা দোষণীয় নয়। ইতিহাসের পাতায় এর ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত বিদ্যমান।

আমরা নিজেদের অযোগ্যতা ঢাকার জন্য তালিবুল ইলম ভাইদেরকে কথা বলার সুযোগ দিই না। এটা অযোগ্যতার বহিঃপ্রকাশ। এ থেকে আমাদের বিরত থাকতে হবে। সুতরাং শিক্ষক যদি যোগ্য হন এবং পাঠাদনের পূর্ণ প্রস্তুতি ও যাবতীয় বিষয় লক্ষ রেখে পাঠদান করেন, তাহলে তালিবুল ইলমদের যোগ্যতা তৈরী হবে। তাদের মেধা শাণিত হবে। তাদের বুঝ পরিপূর্ণ হবে। তবেই তারা বড় আলেম হবে, উম্মাহর দিশারী হবে। এটাই তালীমের উদ্দেশ্য। যা ইহসান ছাড়া পূর্ণ অর্জন করা সম্ভব নয়।

নয়. মেধা ও চিন্তাশক্তি জাগিয়ে তুলতে যে কোন হাশিয়া, শরাহ নিষেধ

ঘ. প্রাথমিক স্তরের তালিবুল ইলমের আরেকটি বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখা খুব জরুরী। আর তা হলো উস্তাদের কথার উপর নির্ভর করে নিজ প্রচেষ্টা ও নিজ মেহনত, মুজাহাদার মাধ্যমে কিতাব বুঝা। হাশিয়া বা শরাহ কেন্দ্রিক মুতালাআ থেকে দূরে থাকা। বিষয়টি আমরা আমাদের আকাবির ও আসলাফ থেকে শুনে এসেছি। পূর্বসূরীদের কিতাবেও তা লিখা আছে।

এর কারণ হলো, প্রাথমিক স্তরের কেউ যদি শুরুতেই হাশিয়া বা শরাহ মুতালাআর দিকে ঝুঁকে পড়ে তাহলে তার ধ্যান, মেধা, ভাবনা ও চিন্তাশক্তি জাগ্রত হবে না। বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জানি না আমি তা কতটুকু লেখার মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে পারবো।

ব্যাখ্যা : মানুষের অভ্যন্তরে সুপ্ত প্রতিভাগুলো প্রকাশ পায় তামরীন বা প্র্যাকটিসের মাধ্যমে। যে যে প্রতিভার যতবেশি প্র্যাকটিস করবে সেক্ষেত্রে তার যোগ্যতা তত প্রকাশ পাবে ও বাড়বে। আর যে প্র্যাকটিস করবে না তার প্রতিভা প্রকাশ পাবে না। অতএব ধ্যান ও মনোযোগেরও প্র্যাকটিস করতে হবে। ছোটদেরকে ছোটকাল থেকে অভ্যস্ত করতে হবে।

হাশিয়া, শরাহ দেখার সুযোগ থাকলে ক্লাসে বসে সে ভাবতে পারে, আমি পরে হাশিয়া—শরাহ দেখে হল করে নিব। অথচ উস্তাদ যোগ্য হলে তার কথা হাশিয়া বা শরাহর চেয়েও মূল্যবান এবং শিক্ষার্থীর জন্য উপকারী ও জরুরী হয়। কিন্তু হাশিয়া, শরাহর কারণে উস্তাদের কথার উপর নির্ভরতা কমে যায়। তার কথার প্রতি ধ্যান ও মনোযোগও কমে যায়। এতে মনোযোগ ও ধ্যানের প্র্যাকটিস হয় না। ফলে তার প্রতিভাও বিকশিত হয় না।

তাছাড়া এ সময়ে দরসে বসে উস্তাদ থেকে নগদ যা অর্জন করতো (অর্থাৎ কিতাব হল করে নেওয়ার কাজ) তা থেকে সে বঞ্চিত হবে। এ সময়টা তার নষ্ট হবে। এ সময়ের কাজটা আবার তার পরবর্তি সময়ে করতে হবে। অথচ পরবর্তি সময়ের জন্য পরবর্তি কাজ রয়েছে। এভাবে একটি কাজ আরেকটি কাজের সাথে যুক্ত হয়ে কাজের বোঝা তার ভারি হবে। সে ধীরে ধীরে পেরেশান হয়ে পড়বে। যার পরিণাম কী হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। লেখা-পড়া ছেড়ে পালাবে।

তাছাড়া হাশিয়া, শরাহ পড়ে কিতাব বুঝার মানসিকতা তৈরী হলে কিতাব এবং উস্তাদের উপর নির্ভর করে নিজে বুঝার যোগ্যতা তৈরী হবে না। চিন্তা করে বুঝার শক্তি ও সাহস পয়দা হবে না। তার চিন্তাশক্তি জাগ্রত হবে না। অথচ চিন্তাশক্তিই হচ্ছে সকল জ্ঞানের উৎস। আর এ চিন্তাশক্তি জাগিয়ে তোলাই হলো শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য।

প্রাথমিক স্তর থেকে যদি এ শক্তি জাগিয়ে তোলা না হয় তাহলে তালিবুল ইলমের কিতাব বুঝার নিজস্ব যে যোগ্যতা বা পাণ্ডিত্যতা, তা অর্জিত হবে না। ফলে উচ্চস্তরে যখন সে এমন সব কিতাব মুতালাআর সম্মুখীন হবে, যেসবের নেই কোনো হাশিয়া বা শরাহ, তখন তার সামনে হতাশার পথ ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না।

সারকথা, একদম প্রাথমিক স্তর থেকে কিতাবের মূল ইবারত হল করার মাধ্যমে নিজে কিতাব বুঝার যে যোগ্যতা শিক্ষার্থীদের মাঝে ধীরে তৈরি করতে হয়, তা হাশিয়া বা শরাহের পাঠে বাধাগ্রস্থ হয়ে পড়ে । বরং এতে অন্যের চিন্তার অনুসরণ ও মুখাপেক্ষিতা বাড়ে, নিজস্ব কোন যোগ্যতায় কিতাব বুঝা আর হয়ে উঠে না । আরবিতে বেশ সুন্দর একটি প্রবাদ রয়েছে—

من قرأ الحواشي ما حوى شيئا

প্রবাদের ভাবার্থটা এভাবে প্রকাশ করা যায়, যে পড়বে হাশিয়া সে যাবে ভাসিয়া।

তাই শিক্ষার্থীদের যোগ্য ও প্রাজ্ঞ করে গড়ে তোলার মানসে প্রাথমিক স্তরগুলোতে আমাদের পাঠদানপদ্ধতি হওয়া চাই কিতাবের মূল ইবারত তথা মূলপাঠ কেন্দ্রিক। হাশিয়া বা শরাহ থেকে তাদেরকে দূরে রাখতে হবে । কারণ, নিজস্ব যোগ্যতায় নিজে

বুঝার নামই হল ইলম। (আল্লাহ চাহে তো এ বিষয়ে আমার একটি কিতাব আসবে العلم الفهم নামে)

তবে এর জন্য আবশ্যক হলো, শিক্ষক যোগ্য হওয়া। ছাত্র গড়ার মানসিকতা লালন করা। এবং সেটাকে বড় ইবাদত, মহান দায়িত্ব ও অসীম সাওয়াবের বিষয় মনে করা।

একটি দুঃখজনক ও খুবই পরিতাপের বিষয়। যা না বলে পারছি না। যেখানে আমাদের আকাবির আসলাফ হাশিয়া, শরাহ পড়তে নিষেধ করেছেন। সেখানে আমাদের বোর্ডগুলোর পরিক্ষাই গাইড নির্ভর হয়ে পড়েছে। শিক্ষার্থীরা গাইড দেখে পরিক্ষা দিচ্ছে। হাশিয়া, শরাহও বাদ দিয়েছে। তাদের বুঝের অভাব কি পরিমাণ তা বলাই বাহুল্য। অথচ স্কুল-কলেজ থেকেও আজকাল নোট, গাইড বাদ দেয়ার মানসিকতা বাড়ছে।

দেশের অত্যন্ত প্রসিদ্ধ একটি কোচিং সেন্টারের পরিচালকের সাথে আমার পরিচয় হয়। তিনি আমাদের মাদরাসায় এসেছিলেন। তিনি বললেন, তিনি যখন কোচিং সেন্টার খুলেন তখন তিনি গাইডের আশ্রয় নিতে ছাত্রদেরকে নিষেধ করেন। অনেকে ভেবেছিল, তিনি সফল হবেন না। তার ছাত্ররা সফল হবে না। কিন্তু তিনি হাল ছাড়েননি।

শুরুতে ছাত্র-সংখ্যা কম হতো। তাই সেন্টার চালাতে তাকে ভর্তুকি দিতে হয়েছে বেশ কিছুদিন। তার কোচিং এর ছাত্ররা যখন পরিক্ষায় ভাল রেজাল্ট করতে শুরু করল। ধীরে ধীরে ছাত্র-সংখ্যা বাড়তে শুরু করল। এখন প্রতিষ্ঠানটি অনেক প্রসিদ্ধ, অনেক লাভজনক। এবং বুয়েটসহ বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির ভাল শিক্ষকরা তার কোচিংয়ের ছাত্র। সে সফরে তার সঙ্গে একজন ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। যিনি একসময় তার কোচিংয়ের ছাত্র ছিলেন। তিনি তার সাব্জেক্টে পুরা বিশ্বে উল্লেখযোগ্য স্থান অর্জন করেছেন। বর্তমানে বুয়েটের শিক্ষক।

যাহোক হাশিয়া, শরাহ না দেখার এ হিকমত বা কৌশলটি ছিল আমাদের। কিন্তু নিয়ে যাচ্ছে অন্যরা। কী পরিতাপের বিষয়!

মূলকথা হলো, শিক্ষার্থীদের ধ্যান, মনোযোগ ও চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। আর তার জন্য যত কৌশল রয়েছে তা অবলম্বন করতে হবে। সে সব কৌশলের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য কৌশল হলো হাশিয়া, শরাহ থেকে ছাত্রদেরকে দূরে রাখা। গাইড, নোটের তো প্রশ্নই আসে না। তবে এ কৌশলের কার্যকারিতা ও সফলতা নির্ভর করবে আরও কিছু বিষয়ের উপর। এক. যোগ্য উস্তাদ। দুই. কঠিন পরিক্ষা।

দশ. যোগ্য শিক্ষক। সঠিক পাঠদান। কঠিন পরিক্ষা।

ঙ. শিক্ষক যোগ্য না হলে ছাত্রদেরকে হাশিয়া, শরাহ বা নোট, গাইড থেকে বিরত রাখার কোন অর্থ থাকে না। তাদরকে যে উদ্দেশ্যে বিরত রাখা হবে তা পূরণ হবে না। বরং তাদের তখন কোন উপায়ই থাকবে না।

আমাদের ঘরানার অনেককে নোট, গাইডের খুব সমালোচনা করতে দেখা যায়। যদিও হাশিয়া, শরাহর সমালোচনা আমাদের আলোচনা থেকে উঠে গেছে। বরং এক লেখায় দেখলাম, লেখক আরবী হাশিয়া, শরাহর প্রতি উৎসাহ দিচ্ছে। অথচ এক সময় আমরাই আমাদের উস্তাদদের নিকট থেকে তারও সমালোচনা শুনতাম। তারা নিষেধ করতেন। আর আমার ধারণা, তা এসেছিল আমাদের দেওবন্দের আকাবিরদের নিকট থেকে।

যাইহোক নোট-গাইডের সমালোচনা যা আছে তাও কম না। বরং এটাও অনেক। এতে কিছুটা হলেও ঘৃণা জাগবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় তারা আবার শিক্ষকদের যোগ্যতা, অযোগ্যতার বিষয় নিয়ে কোন কথা বলেন না। বা এ বিষয়ে কোন পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত না। শুধু কথায় তাদের কাজ শেষ। তবে তা যে একবারে শূন্যের কোঠায় তাও না। কিছু দায়িত্বশীল আন্তরিক ব্যক্তি রয়েছেন যারা তাদের প্রতিষ্ঠানে তা বাস্তবায়ন করছেন। তারা সংখ্যায় খুব কম। আল্লাহ তাদেরকে খুব সাহায্য করুন। এবং অন্যদেরকে তাদের অনুকরণ করার তাওফীক দান করুন।

পরিক্ষা যদি দুর্বল হয়, সঠিকভাবে কৃতকার্য, অকৃতকার্য বাছাই না হয় এবং অকৃতকার্যদেরকে উপরের ক্লাসে যাওয়ার পথ বন্ধ করা না হয় তাহলেও উপর্যুক্ত পদক্ষেপ কোন উপকারে আসবে না। তারা যখন দেখবে, না পড়েও পাশ করা যায় বা সুপারিশে উপরে উঠা যায়, তাহলে শয়তান তাকে আর পড়তে দিবে না।

আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলোতে এ ক্যান্সার অনেক শিক্ষার্থীকে শেষ করে দিচ্ছে। বরং অধিককে। পরিক্ষগুলোর না মান আছে, না দাম আছে। পরিক্ষায় সবাই পাশ। কোন কারণে যদি কেউ অকৃতকার্য হয় তারাও সুপারিশের মাধ্যমে বা বিভিন্ন কৌশলে পার পেয়ে যায়।

উপর্যুক্ত দুটি বিষয় খুবই পরিস্কার। যোগ্য শিক্ষক ও সঠিক পরিক্ষা। কলমে খোঁচার কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু নির্লজ্জ হলে এ বিষয়ে না লিখেও পারলাম না। দুঃখ বুঝার কোন প্রাণ খুঁজে পাচ্ছি না। তাই প্রাণহীন পাতায় রেখে গেলাম ব্যাথা। যদি সে কোন দিন প্রাণ খুঁজে পায়।

আমার বক্তব্যের অর্থ এটা নয় যে, একেবারেই হাশিয়া বা শরাহ দেখা যাবে না। বরং প্রাথমিক স্তরের জন্যই কেবল এ নিষেধাজ্ঞা । কিন্তু যখন কিতাব বুঝার বা হল করার নিজস্ব যোগ্যতা পূর্ণমাত্রায় অর্জন হবে, তখন ইস্তিফাদার লক্ষ্যে নেসাবের বাইরে শত শত বিষয়ভিত্তিক কিতাব, হাশিয়া, শুরুহাত মুতালাআ করতে কোন অসুবিধা নেই। বরং তখন তা শুধু উপকারী নয় শুধু, জরুরী বলেও বিবেচিত হবে ।

এগার.

প্রথমে শাব্দিক অর্থ, তারপর ভাবার্থ, তারপর উদ্দেশের ব্যাখ্যা

চ. প্রাথমিক স্তরের তালিবুল ইলমদের পাঠদানের ক্ষেত্রে আরেকটি বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখা অত্যন্ত জরুরী। তা হলো তাদেরকে লফযের তাহকীক শিক্ষা দেওয়া। অর্থাৎ তরজমার ক্ষেত্রে প্রথমে উর্দূ, ফার্সী, আরবী ইবারতের শাব্দিক অর্থ বলা, শুরুতেই ভাবার্থ না বলা।

শাব্দিক অর্থ বলার অর্থ হলো, প্রতিটি শব্দ তাদেরকে চিনিয়ে দেওয়া, শব্দের সাথে শব্দের সম্পর্ক এবং অর্থের মাঝে তা কীভাবে উঠে আসে এগুলো তাদেরকে ধরিয়ে দেওয়া। ইসম, ফেয়েল, হরফে জার, মাওসূল, সেলা ইত্যাদি প্রতিটি অংশের অর্থ তাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়া। শুধু ভাবার্থ ও সারমর্ম বলে ক্ষান্ত না হওয়া। তা না হলে অন্য ভাষার বাক্য—গঠন তারা বুঝবে না।

শাব্দিক অর্থ ও ভাবার্থ উভয়টি কেন করা হচ্ছে সেটিও তাকে বুঝিয়ে দেওয়া। ভাষা পরিবর্তনের কারণে যে শব্দগুলোর স্থান পরিবর্তন হয়ে যায় সেটি তাকে ধরিয়ে দেওয়া। যেমন : আরবী শব্দের ধারাবাহিকতা অনুযায়ী ضرب زيد عمرا في الدار এর অর্থ হবে, মেরেছে যায়েদ আমরকে ঘরে। কিন্তু বাংলা ভাষায় এ ধারাবাহিকতা থাকবে না, ভাষা অনুযায়ী স্থান পরিবর্তন হয়ে যাবে। অর্থ হবে, যায়দ আমরকে ঘরে মেরেছে।

এভাবে প্রথমে প্রতিটি বাক্যের শব্দগুলো তথা ইসম, ফেয়েল, হরফ ইত্যাদি চিহ্নিত করে সেগুলোর অর্থ তাদেরকে শিখানো। যাতে তারা সে ভাষার বাক্যগঠন বুঝতে পারে। অতঃপর ভাবার্থ করা। যাতে নিজ ভাষায় রূপান্তরের ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন হয় তা বুঝতে পারে। এজন্য বলা হয়,

لفظ را تحقيق خواني تاشوي مرد كمال

বিভিন্ন কিতাবে এ বিষয়ে পরিষ্কার বা ইঙ্গিতমূলক আলোচনা রয়েছে। যেমন নাহবেমীরে উল্লেখ হয়েছে:

بدانکہ چوں کلمات جملہ بسیار باشد اسم وفعل وحرف را بایکدیگر تمییز باید کردن ونظر کردن کہ معرب ست یا مبني، وعامل است یا معمول،وباید دانستن کہ تعلق کلمات بایکدیگر چہ گونہ است؟ تا مسند ومسند الیہ پیدا گردد، ومعنی جملہ بتحقیق معلوم شود.

এটি এজন্য জরুরী যে, কুরআন—হাদীসের গভীর অর্থ ও সূক্ষ্ম মর্ম বুঝার ক্ষেত্রে শব্দের ব্যাপক প্রভাব থাকে। তাছাড়া আইনের ভাষা, চুক্তিপত্রের ভাষা ও সে সংক্রান্ত বইপত্রের বক্তব্যের মাঝেও শব্দের ব্যাপক ভূমিকা থাকে। শব্দের মারপ্যাচ বুঝে না আসলে আইন বুঝে আসবে না। আর কুরআন-হাদীস তো সবচেয়ে বড় আইনের উৎস। এতে মানুষের জীবনের বিধান রয়েছে, আখলাক বা নৈতিকতার বিধান রয়েছে হুদুদ—কিসাসের বিধান রয়েছে।

এ আইন ও বিধানগুলোকে কুরআন হাদীস ও ফিকহের ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে। তাই শব্দের অর্থ, শব্দের পারস্পরিক সংযোগ, আগ-পর হওয়া, অলংকার শাস্ত্র (ইলমুল বালাগার কাওয়াইদ) ইত্যাদি ভালোভাবে খেয়াল না করলে কুরআন

হাদীসের আহকাম, কানুন ইত্যাদির মাঝে এগুলোর প্রভাব বুঝে আসবে না। আর এগুলো না বুঝলে বিজ্ঞ আলেম হওয়া যাবে না।

তাই প্রাথমিক স্তর থেকেই শব্দের তাহকীক শেখা শুরু করতে হবে এবং ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে হবে। তাহলে তাদের মেধা খুলবে এবং উচ্চস্তরে তারা কুরআন–হাদীস ও ফিকহের অতিসূক্ষ্ম শাব্দিক প্রয়োগগুলো বুঝতে পারবে। আর প্রাথমিক স্তর থেকে শিখে শিখে অগ্রসর না হলে যখন কুরআন–হাদীসের সূক্ষ্ম শাব্দিক প্রয়োগগুলো সামনে আসবে তখন তারা হাল ছেড়ে দিবে, সেগুলো কিছুই বুঝতে পারবে না। তাই প্রাথমিক স্তর থেকেই তাদেরকে শব্দের তাহকীক শিখানো জরুরী।

এছাড়াও প্রাথমিক স্তর থেকেই তাদের মাঝে প্রয়োজনীয় সকল যোগ্যতার বীজ বপন করা এবং স্তর অনুযায়ী পরিচর্যা করে তার বিকাশ ঘটানো জরুরী। যাতে ভবিষ্যতে তারা পরিপক্ক হয়ে তাদের মহান জিম্মাদারী সঠিকভাবে আদায়ে সমর্থ হয়। যোগ্যতার অভাবে পিছিয়ে না পড়ে অথবা অযোগ্যতা সত্ত্বেও বড় দায়িত্ব নেয়ার দুঃসাহস না করে। যা হবে নিজের ও জাতির জন্য বড় বিপর্যয়ের কারণ। তাই এক্ষেত্রে অবহেলা করা হবে তাদের সাথে চরম খেয়ানত এবং তাদেরকে আত্মিকভাবে খুন করার শামিল।

বার.

‘দীন প্রমাণিত, বোঝার প্রয়োজন নাই’- এ ধারণা মাদরাসা-শিক্ষার বড় ক্ষতি করেছে!

বোঝার প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে অনেকের মনে একটি প্রশ্ন জাগে যে, শরীয়ত মেনে চলাটা অবধারিত। বুঝে আসলেও মানতে হবে, বুঝে না আসলেও মানতে হবে। শরীয়তের গণ্ডির বাইরে যাওয়া যাবে না। তেমনিভাবে মাযহাবের তাকলীদ করাটাও অপরিহার্য। বুঝে আসলেও করতে হবে, বুঝে না আসলেও করতে হবে। ইমামগণের কথার বাইরে যাওয়ার সুযোগ নেই। এটাই তো তাকলীদ। তাকলীদ তো না বুঝে অনুসরণ করার নামই। সুতরাং শরীয়ত ও মাযহাবের গন্ডির বাইরে যখন যাওয়ার সুযোগ নেই, বুঝে আসুক বা না আসুক, তাহলে এক্ষেত্রে বোঝার প্রয়োজন কী?!

এমন একটা প্রশ্ন অনেকের মনেই আছে, যার ফলে বোঝার প্রয়োজনীয়তাটা তাদের কাছে প্রশ্নবিদ্ধ। এমনকি যাদেরকে বড় মনে করা হয় তাদের অনেকের নিকটও বিষয়টি পরিস্কার নয়। আমি ঢাকায় একটি সেমিনারে ছিলাম। সেমিনারের আলোচ্য বিষয় ছিল, কাকড়া চাষ করা ও তা বিক্রি করা মুসলমানদের জন্য বৈধ কিনা?। অনেক আলোচনা হলো, কিন্তু কোন সুরাহা হচ্ছিল না। আমি বললাম, এখানে মূল বিষয়টি পরিস্কার হওয়া দরকার, বোঝা দরকার; দলীল-ইল্লতগুলো সামনে আসা দরকার। শুধু পরস্পর বিরোধী কিছু ফিকহী ইবারত নিয়ে আলোচনার দ্বারা বিষয়টি পরিস্কার হবে না।

আসলে ইবারতগুলোর দ্বন্দ্ব ছিল বাহ্যিক, মর্মগতভাবে কোন দ্বন্দ্ব ছিল না; দলীল-ইল্লতের আলোকে পর্যালোচনা করলে দ্বন্দ্ব দূর হয়ে যেত। কিন্তু এ দিকে কেউ দৃষ্টি দিচ্ছিল না। আমি যখন এ কথাটা বললাম, একজন বড় ব্যক্তি বলে বসলেন, "দলীল তো গায়রে মুকাল্লিদ তালাশ করে, মুকাল্লিদ তো দলিল তালাশ করে না।" অর্থাৎ দলীলভিত্তিক বোঝাটা গায়রে মুকাল্লিদের কাজ, মুকাল্লিদের দলীল বোঝার প্রয়োজন নেই।

সে মজলিসে বিষয়টি আর সমাধান হল না। ফলে একটি কমিটি করা হল। সে কমিটিতে অধমকেও রাখা হল। সাধারণত এমনই করা হয়। বড় মজলিসে যখন সমাধানে পৌঁছা সম্ভব হয় না তখন নির্বাচিত কয়েকজনের একটি ছোট কমিটি গঠন করা হয়। সে কমিটি মজলিসের সকলের গবেষণাপত্র ও মতামতকে সামনে রেখে একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছার চেষ্টা করে। তারপর তা বড় মসলিসে সকলের সামনে পেশ করে। বড় মজলিসে তা গৃহিত হলে সিদ্ধান্ত আকারে তা চূড়ান্ত করা হয়।

যাইহোক, সে ছোট কমিটির সদস্যদের মাঝে আমার কাঁধেই সেটা সমাধানের দায়িত্ব আসলো। আমি আলোচ্য বিষয়ের স্বীকৃত মূলনীতিগুলোকে সামনে এনে সেগুলো পয়েন্ট আকারে এক নং দুই নং করে সাজালাম। তারপর ধাপে ধাপে আলোচনা করে দলীল-ইল্লতের আলোকে বিষয়টি পরিস্কার করার চেষ্টা করলাম। তখন বিষয়টি সবার কাছে পরিস্কার হলো, ফিকহী ইবারতের দ্বন্দ্ব দূর হল, ফলে সিদ্ধান্ত কী হবে তাও স্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠল। এবং সকলে তা মেনে নিলেন।

যাহোক ঘটনাটি বলার উদ্দেশ্য হলো, বুঝের ব্যাপারে এমন একটি মানসিকতা অনেকের মাঝেই আছে– এটা স্পষ্ট করা। আর এ মানসিকতার প্রভাব একেবারে প্রাথমিক স্তরের মাঝে গিয়েও পড়ে। আমাদের এত বোঝার প্রয়োজন নেই– এ মানসিকতার ফলে উপরেও যেমন বোঝার চেষ্টা করা হয় না নিচেও এর তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। ফলে শিক্ষার্থীদের মাঝে ছোটকাল থেকেই যে বোঝার মানসিকতা তৈরী হওয়া দরকার তা আর হয়ে উঠে না।

অতএব এ বিষয়টি পরিস্কার হওয়া অত্যন্ত জরুরী। শিক্ষাক্ষেত্রে ইহসানের আলোচনায় এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ, ছাত্রদের পিছনে সুন্দর ও সুচারুরূপে মেহনত করার উদ্দেশ্য, তাদেরকে বুঝবান, বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ করে গড়ে তোলা। আর তাদেরকে বিজ্ঞ ও বুঝবান করে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা তখনই আমরা করব যখন বুঝের প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি আমাদের থাকবে। কারণ, কোন বিষয়ের প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি যদি না থাকে, তার পিছনে ত্যাগ স্বীকার করবে বলে আশা করব কীভাবে?

এখন শিক্ষাব্যবস্থার যে অবনতি তার পিছনে একটি বড় কারণ হলো, অনেক বিষয়ের প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি না থাকা। অথচ বিষয়গুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর এ উপলব্ধির অভাবে প্রয়োজন পুরা করার দায়িত্ব আর কেউ নেয় না। দায়িত্ব না আসলে যেমন অনেক সময় প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি জাগে না তেমনিভাবে প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি না থাকলে দায়িত্ব পালনের মানসিকতা জাগে না। আমাদের অবস্থা বলে, আমরা উভয় সমস্যায় জর্জরিত। ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে এত অবনতি।

সুতরাং এ বিষয়টি পরিস্কার না করলে শিক্ষাক্ষেত্রে ইহসানের অন্য সকল আলোচনা বেকার হয়ে যাবে। সে আলোচনাগুলোর প্রতি কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাবে না।

এ ভ্রান্ত চিন্তাধারা ও বিকৃত মানসিকতার কয়েকটি ধাপ তথা একটি বিস্তারিত রূপ রয়েছে। এ বিষয়টি পরিস্কার করার জন্য সে ধাপগুলো চিহ্নিত করে সেগুলোর নিরসন করা জরুরী। সে ধাপগুলো হলো :

তের.

কুরআন-হাদীস প্রমাণিত, নতুন করে বুঝার প্রয়োজন নেই

সংশয়-১

কুরআন-হাদীস প্রমাণিত সত্য। তাই কুরআন-হাদীস নতুন করে প্রমাণ করার কিছু নেই। এটাতো হক। হককে নতুন করে প্রমাণ করার কী দরকার? নতুন করে প্রমাণের যেহেতু প্রয়োজন নেই তাই কুরআন-হাদীসকে নতুন করে বোঝারও প্রয়োজন নেই।

আমাদের বড়রা, যারা জ্ঞানী, দার্শনিক, মুনাযির ছিলেন; তাঁদের এ মানসিকতা ছিল না। কারণ, তাঁরা দায়িত্বশীল ছিলেন। কুরআন-হাদীস নিয়ে প্রতিপক্ষের অনেক সংশয় ও আপত্তি তাঁদের সামনে এসেছে। তাঁরা সেগুলো খণ্ডনের দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছেন। কুরআন-হাদীস তথা জ্ঞানের সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে, গভীর বুঝ অর্জন করে প্রতিপক্ষের খণ্ডন করেছেন।

তাই কুরআন-হাদীস প্রমাণিত সত্য, স্বীকৃত সত্য; একে নতুন করে প্রমাণ করার কী দরকার?— এমন মানসিকতা তাঁদের ছিল না।

কিন্তু আমরা দায়িত্বের ব্যাপারে উদাসীন। প্রতিপক্ষের সংশয় ও আপত্তির প্রতি আমাদের ভ্রুক্ষেপ নাই। বাস্তবতার দিকে আমাদের খেয়াল নাই। তাই আমাদের এমন মানসিকতা তৈরী হয়েছে।

সংশয়-২

কুরআন-হাদীসের পরের স্তর হলো ইমামগণের ইজতিহাদ। ইজতিহাদী মাসায়িলের ব্যাপারে অনেকে এমন ধারণা রাখেন যে, ইমামগণ কোন সূত্রে, কোন ভিত্তিতে, কোন দলিলের আলোকে ইজতিহাদ করেছেন; এটা আমাদের বোঝার প্রয়োজন নাই। তারা বড় ছিলেন, মুজতাহিদ ছিলেন। তারা যে ইজতিহাদ করে গেছেন, সেটা আমাদের মেনে চলতে হবে। এখন নতুন কোন ইজতিহাদের প্রয়োজন নাই তাই আমাদের বোঝারও প্রয়োজন নাই। অতএব আমরা কেন বোঝার চেষ্টা করব?

তাছাড়া আমাদের মেধাশক্তি দুর্বল, আমরা চেষ্টা করলেও তাদের চেয়ে বেশী বুঝব না। আমরা বুঝলেও সেটা প্রয়োগ করতে পারব না। তাই ইমামগণ যা বলে গেছেন তাই আমাদের মানতে হবে। নতুন করে বোঝার ও বোঝানোর কোন প্রয়োজন নাই।

সংশয়-৩

বাচ্চাদের কী বোঝাবো? তাদেরকে বোঝালে তারা কতটুকু বুঝতে পারবে? এগুলো তাদের বোঝার জিনিস না। তারা তো শুধু মুখস্থ করবে।

বোঝার প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে উপর্যুক্ত সংশয়গুলো অনেকের মাথায় আছে। এগুলো কিছু এলোমেলো চিন্তা। এগুলো কোনটাই জ্ঞানী, বুদ্ধিমানের প্রশ্ন না। কিন্তু আমাদের অবস্থা এতটা শোচনীয় যে, এগুলোই প্রশ্ন আকারে আমাদের কাছে হাজির হয়। এবং আমাদের মাথায় আসন গেড়ে বসে।

অথচ দ্বীনী শিক্ষাব্যবস্থার জিম্মাদারি আমাদের কাঁধেই। বাচ্চাদের পড়াশোনা আমাদের তত্ত্বাবধানেই হয়। তাই আমাদের এমন এলোমেলো চিন্তার প্রভাব তাদের পড়াশোনার উপর গিয়ে পড়ে। ফলে তারাও বুঝতে শিখে না, বোঝার চেষ্টা করে না। আর এভাবেই পড়াশোনার ইতি টানে।

অতএব, এটা একটা প্রজন্মের সংকটে পরিণত হয়েছে। আমাদের একটা বিরাট অংশ এ বিভ্রান্তির বেড়াজালে আবদ্ধ। আর এ বিভ্রান্তিকর মানসিকতার কারণে আমাদের দ্বীনী শিক্ষাব্যবস্থা চরম অধঃপতনের শিকার। তাই এ সংশয়গুলো নিরসন করা অত্যন্ত জরুরী। সামনে এক এক করে এ সংশয়গুলো নিরসনের চেষ্টা করব।

চৌদ্দ.

প্রমাণিত বিষয়কে প্রমাণের আলোকে বোঝা অনেকের জন্যই জরুরি হয়

প্রথম সংশয়ের নিরসন: প্রথম সংশয় ছিল, কুরআন-হাদীস প্রমাণিত সত্য। একে নতুন করে প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই। তাই কুরআন-হাদীস বোঝারও প্রয়োজন নাই।

এর উত্তর: এখানে কয়েকটি বিষয় রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন।

এক: কোন সত্য বা বাস্তব বিষয় কারো কাছে উদঘাটিত হওয়া বা প্রকাশ পাওয়া, চাই তার প্রচেষ্টার মাধ্যমে হোক বা হঠাৎ হোক- এটা ঐ ব্যক্তির গুণ। তার উপর আল্লাহর বিশেষ দান।

দুই: সে সত্য বা বাস্তব বিষয়টিকে অন্যের নিকট প্রকাশ করা বা প্রমাণ দিয়ে প্রমাণিত করে তাকে বুঝাতে চেষ্টা করা। অনেক ক্ষেত্র এটা তার দায়িত্ব ও কর্তব্য হয়ে দাড়ায়। তার জন্য যা আদায় করা জরুরী। না হয় সে গুনাহগার হবে। ইলম গোপন করার গুনাহ হবে।

তিন: প্রথম ব্যক্তির প্রদত্ত প্রমাণাদির আলোকে দ্বিতীয় ব্যক্তির সে সত্য বা বাস্তবকে উপলব্ধি করা ও বুঝতে চেষ্টা করা। এটা দ্বিতীয় ব্যক্তির কাজ। যা তার মেধা, চিন্তা, ধ্যান ও আন্তরিকতার উপর নির্ভর করে। এবং তা অনেক ক্ষেত্রে জরুরী হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ যে ক্ষেত্রের ইলম অর্জন করা তার জরুরী সে ক্ষেত্রে।

দ্বিতীয় বিষয়টি অর্থাৎ সত্যকে প্রমাণিত করা বা প্রমাণ দিয়ে সত্যকে অন্যের সামনে প্রকাশ করা বা সাব্যস্ত করা ঐ ব্যক্তির কাজ যার কাছে প্রথম বিষয়টি পরিস্কার হয়েছে। অর্থাৎ সত্য তার কাছে প্রকাশিত হয়েছে, প্রমাণিত হয়েছে। আর তৃতীয়টি ঐ ব্যক্তির কাজ যার কাছে সত্যটি এখনো প্রকাশিত হয়নি, প্রমাণিত হয়নি।

বিষয়টি এভাবেও বলা যায়, প্রথম ও দ্বিতীয়টি শিক্ষকের কাজ। আর তৃতীয়টি শিক্ষার্থীর কাজ।

মোটকথা, যার কাছে সত্য প্রকাশিত তার কাজ হলো সত্যকে অন্যের কাছে প্রকাশ করা ও প্রমাণ করা। আর যার কাছে সত্য এখনো প্রকাশিত হয়নি তার কাজ হলো, যে ব্যক্তির কাছে সত্য প্রমাণিত ও প্রকাশিত হয়েছে তার দেয়া প্রমাণের আলোকে সত্যকে উপলব্ধি করা ও বুঝা।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অনেকটা আকাশে নতুন চাঁদ দেখার মত। চাঁদ যার চোখে ভেসে উঠেছে -চাই আকস্মিক হোক বা খোঁজাখুঁজি করার পর- সে বাকি দর্শকদের দেখাতে শুরু করে। খেজুর গাছের মাথার উপর দেখুন বা ডানদিক বা বাম দিক

থেকে দেখুন। এভাবে বিভিন্ন এঙ্গেল থেকে দেখতে দিক-নির্দেশনা দেয়। তখন অন্যরা তার দিক-নির্দেশনায় দেখতে পায়।

তবে জ্ঞান-আকাশের অন্তহীন দিগন্তে চাঁদ শুধুমাত্র একটি নয়, অনেকগুলো। যে যতবেশি দেখবে তার ঈদ ততবেশি জমবে। এবং তার আনন্দও ততবেশি হবে।

তাছাড়া রয়েছে অদৃশ্য অনেক গ্রহ-নক্ষত্র। যা সাধারণ জ্ঞানের খালি চোখে দেখা যায় না। প্রয়োজন পড়ে মালাকা, মাহারার বা দীর্ঘ অভিজ্ঞতার শক্তিশালী (হাবল) টেলিস্কোপ, দূরবীক্ষণযন্ত্রের। তারপরও চোখে লাগানোমাত্রই সব ভেসে উঠে না। বিভিন্ন এঙ্গেল বা কোন থেকে অনুসন্ধান চালিয়ে যেতে হয়। তারপর ভেসে উঠতে থাকে এক এক করে বিদ্যার জ্যোতিস্কগুলো। আর এখানেই পার্থক্য হয়ে যায় বিদ্বানদের মাঝে। যার দিকে ইঙ্গিত রয়েছে-

﴿يَرۡفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ دَرَجَٰتٖ﴾ (سورة المجادلة 11)

সহ অনেক আয়ত ও হাদীসে।

তাই শিক্ষার্থীদেরকে এভাবেই গড়ে তুলতে হবে। যেন তাদের অন্তর্দৃষ্টি খুলে যায় এবং তারা শক্তিশালী দূরবীক্ষণ ও অনুবিক্ষণ যন্ত্রের অধিকারী হয়ে যায়।

পনের.

একটি বিভ্রান্তির নিরসন

এখানে আরেকটি বিভ্রান্তি রয়েছে যা দূর হওয়া দরকার উপর্যুক্ত সংশয় নিরসনের জন্য। এই যে বলা হয়, কুরআন-হাদীস বা এর বিষয়গুলো প্রমাণিত। নতুন করে প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই। এখানে কিন্তু একটি বিষয় অস্পষ্ট থেকে যায়, একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে, সে কে, যার কাছে কুরআন-হাদীসের বিষয়গুলো স্পষ্ট প্রমাণিত এবং তার প্রমাণের প্রয়োজন নাই? সবাই কি এমন? যদি সবাই এমন হয় তাহলে উপর্যুক্ত কথা মেনে নিতে আপত্তি থাকবে না। কিন্তু বাস্তবতা এমন নয়। এখানে দুটি পক্ষ রয়েছে। এক পক্ষ: যাদের নিকট বিষয়গুলো পরিস্কার, প্রমাণিত। তাদের জন্য নতুন করে প্রমাণের প্রয়োজন নেই। আরেক পক্ষ: যাদের নিকট বিষয়গুলো

পরিস্কার নয়, প্রমাণিত নয়। তাদেরকে প্রমাণের আলোকে বুঝানোর প্রয়োজন রয়েছে।

প্রথম পক্ষের প্রথম সত্তা মহান রব্বুল আলামীন। সর্বজ্ঞানের অধিকারী তিনিই। তিনি প্রমাণের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করেন না। তিনি প্রমাণের মুখাপেক্ষি নন। জ্ঞান তার সত্তাগত গুণ। সত্তাগত দিক থেকে যেমন কেউ তার সমতুল্য নেই এবং হতে পারবে না, জ্ঞানের ক্ষেত্রেও তার সমতুল্য হতে পারবে না। অন্যকে তিনিই জ্ঞান দান করেন। প্রমাণও তিনি তৈরী করেন। জ্ঞান ও প্রমাণে সবাই তার মুখাপেক্ষি।

এরপর তিনি মানব ও ফেরেস্তো হতে নির্বাচন করেন রিসালাতের জন্য। তাদেরকে মনোনীত করেন রসূল হিসাবে।

ٱللَّهُ يَصۡطَفِي مِنَ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ رُسُلٗا وَمِنَ ٱلنَّاسِۚ (سورة الحج 75)

তাঁদের তিনি সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম মাধ্যমে (ওহীর মাধ্যমে) জ্ঞান দান করেন। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন :

وَكَذَٰلِكَ نُرِيٓ إِبۡرَٰهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلۡمُوقِنِينَ (سورة الأنعام 75)

আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জ্ঞান দান করেছেন সবচেয়ে বেশী, প্রমাণ দান করেছেন সবচেয়ে শক্তিশালী: আল-কুরআন। স্বচক্ষে দর্শন করিয়েছেন জান্নাত, জাহান্নামসহ অনেক কিছু। মেরাজের রজনীতে। এরপর তাঁকে প্রেরণ করেছেন সত্যদীনের দাওয়াত দেয়ার জন্য। সত্যকে প্রমাণ করার জন্য। এটা গেল প্রথম পক্ষের বর্ণনা।

দ্বিতীয় পক্ষ মক্কার পৌত্তলিক মুশরিক। যারা ছিল সত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে অবস্থানকারী। আল্লাহর রসূল আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান ও প্রমাণ দ্বারা তাদেরকে বুঝাতে থাকলেন, দাওয়াত দিতে থাকলেন। সত্য দ্বীনের, তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের। ন্যায় ও ন্যায়বিচারের। দীর্ঘ ২৩ বছর পর্যন্ত। তৈরী হল সকল যুগের শ্রেষ্ঠ একটি সত্যপথের জ্যোতির্ময় দল। তাঁদের হাতে তৈরী হল এমন আরও একটি দল। এভাবে এ ধারা এখনো চলমান। এ সবের ভিত্তি কুরআন। যাতে রয়েছে সত্যের প্রমাণ, প্রমাণের আলোকে সত্য গ্রহণের দাওয়াত।

কাজেই যখন বলা হয়, কুরআন-হাদীসের বিষয়গুলো প্রমাণিত সত্য। এগুলো নিয়ে আর আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। তখন উদ্দেশ্য হয় প্রথম পক্ষ। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার তো প্রমাণ জানার প্রশ্নই আসে না। তদ্রুপ আল্লাহর রসূলেরও আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের পর আর কারও নিকট থেকে জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজন নেই। বরং তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর কিতাবের প্রমাণ অন্যের নিকট পেশ করেন। তাদেরকে জ্ঞান দান করেন।

وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ (سورة النحل44)

তবে সাহাবাদের প্রমাণের প্রয়োজন ছিল। যেহেতু তাদের কাছে বিষয়গুলো পরিস্কার ছিল না। তাই কুরআনে প্রমাণ উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তাঁরা যখন রসূলের সান্নিধ্যে থেকে তাঁর বর্ণনার আলোকে দ্বীনকে বুঝে নিয়েছেন তাদেরও আর প্রমাণের প্রয়োজন বাকি থাকল না। কিন্তু এক সময় তাদের প্রয়োজন ছিল।

যেমন : যে একবার চাঁদ দেখে নিয়েছে তাকে আর চাঁদ দেখানোর প্রয়োজন নাই। কিন্তু যারা এখনো দেখেনি তাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করা ও তাদের দেখার চেষ্টা করার প্রয়োজন আছে। তদ্রূপ যারা এখনো কুরআন ও হাদীসের বিষয়গুলো বুঝে নিতে পারেনি তাদের সামনে প্রমাণগুলো খুলে মেলে তুলে ধরার প্রয়োজন আছে। প্রমাণের আলোকে বুঝানোর প্রয়োজন আছে। তাদের বুঝে নেয়ার প্রয়োজন আছে। তাই আল্লাহ তাআলাও বারবার চিন্তা ফিকির করে কুরআনকে বুঝে নিতে বলেছেন। এ বিষয়ে অনেক আয়াত রয়েছে।

সুতরাং যারা বলে যে, কুরআন-হাদীস প্রমাণিত সত্য। তাকে প্রমাণ করে বুঝানোর প্রয়োজন নাই। তারা দ্বিতীয় দলটির কথা স্মরণে রাখে না। বরং তাদের খামখেয়ালী কথায় এ দল তাদের কথার বাহিরে থেকে যায় বা অজান্তে তাদেরকে প্রথম দলের অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হয়। আর উভয়টিই বিভ্রান্তি। যা থেকে বের হয়ে আসা জরুরী। না হয় কুরআন-হাদীসের জ্ঞানের ধারা বন্ধ হয়ে যাবে। শব্দ থাকতে পারে অর্থ থাকবে না। তাছাড়া প্রমাণিত সত্যগুলো সবাই সমানভাবে বুঝে না। যেমন মা-বাবা প্রমাণিত সত্য। কিন্তু ছোট শিশু মা-বাবা বুঝে না। একটা সময় যাওয়ার পর সে বুঝে। এরকম আরও অনেক প্রমাণিত সত্য আছে যেটা সবাই সমানভাবে উপলব্ধি করে না। কেননা প্রমাণিত সত্য প্রমাণিত হলেও সেটা সবার চিন্তা ও চেতনার জগতে প্রমাণিত থাকে না। তাদের চিন্তা ও বিশ্বাসের জগতে সেটি প্রতিষ্ঠিত করার

জন্য তাদের সাথে প্রমাণ নিয়ে আলোচনা করতে হয়। আর এ কারণে আল্লাহ তাআলা কুরআনের প্রমাণিত সত্যগুলো বোঝার জন্য প্রমাণ দিয়েছেন। তাওহীদ, রেসালাত, আখেরাত সবই প্রমাণিত সত্য। কিন্তু এগুলোর জন্য আল্লাহ তাআলা অনেক প্রমাণ দিয়েছেন এবং তা বুঝার জন্য চিন্তা-ভাবনার নির্দেশ করেছেন।

আমরাও এমন করি। একটা বিষয় প্রমাণিত সত্য, সেটা আমার কাছে স্পষ্ট। কিন্তু আরেকজনের কাছে স্পষ্ট না। তার কাছে স্পষ্ট করার জন্য আমি প্রমাণ দিই। অর্থাৎ কোন বিষয় প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও সে প্রমাণ নিয়ে আলোচনা করি অন্যকে বোঝানোর জন্য। তারপর সে ঐ সত্যকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়।

এর সুন্দর একটি উদাহরণ হলো, অংক ও তার সূত্রগুলো। অংক ও তার সূত্রগুলো প্রমাণিত ও নির্ভুল– এতে দ্বিমতের কোন সুযোগ নাই। কিন্তু এগুলো বাচ্চাদের আয়ত্ত্বে থাকে না। তাকে প্রমাণ দিয়ে বোঝাতে হয়। এর জন্য বিভিন্ন উদাহরণ ও দৃষ্টান্ত পেশ করতে হয়। বিভিন্ন কলা-কৌশল অবলম্বন করতে হয়। এভাবে একসময় সেটা তার কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়।

অতএব কুরআন-হাদীস প্রমাণিত সত্য। অর্থাৎ প্রমাণাদি দ্বারা প্রমাণিত, নির্ভুল ও ধ্রুবসত্য। কিন্তু সে প্রমাণগুলো নিয়ে আলোচনা করতে হবে এবং সেগুলোর মাধ্যমে কুরআন-হাদীস বুঝতে হবে। অন্যথায় বুঝে আসবে না। বুঝটা পর্দার আড়ালে থেকে যাবে। সে পর্দার ভিতরে ঢুকতে হবে। প্রমাণগুলো বুঝে অজ্ঞতার পর্দা অতিক্রম করে জ্ঞানের জগতে ঢুকতে হবে, সত্যের আলোতে উদ্ভাসিত হতে হবে।

এজন্য যারা এ সকল প্রমাণ বুঝতে চেষ্টা করে না, তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না তাদের সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে, তাদের অন্তর ও কর্নে মোহর মারা হয়েছে, তাদের চোখে পর্দা পড়ে গিয়েছে।

خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمۡ وَعَلَىٰ سَمۡعِهِمۡۖ وَعَلَىٰٓ أَبۡصَٰرِهِمۡ غِشَٰوَةٞۖ (سورة البقرة 7)

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা বোঝার জন্য প্রমাণ দিয়েছেন, কিন্তু সে বুঝবে না। কারণ, তার সামনে পর্দা পড়ে গেছে। সে সেটা অতিক্রম করতে পারবে না।

এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, প্রমাণিত বিষয়ও ব্যক্তি বিশেষের সামনে পর্দা ও আবরণ থাকার কারণে সে তা বুঝতে পারে না। সে আবরণটা হলো মূর্খতার আবরণ। উদাসীনতার আবরণ। প্রমাণিত সত্য উদঘাটন করতে হলে তাকে সে আবরণটা ছেদ করতে হবে। যার তাওফীক হবে সে পারবে আর যার তাওফীক হবে না সে পারবে না।

সুতরাং প্রমাণিত সত্য হলেই সেটা মানুষের কাছে সুস্পষ্ট থাকবে– বিষয়টি এমন না। বরং বোঝার স্তরে পৌঁছলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে। আর মানুষ ধীরে ধীরেই বুঝে। একসাথে একবারে বুঝে ফেলে না। বরং বোঝার চেষ্টা করে করে বুঝতে পারে, অংকের সূত্রের মত। তাই কুরআন-হাদীস প্রমাণিত সত্য হলেও তা আমাদের বোঝার প্রয়োজন আছে।

তবে সবার সমানভাবে বুঝতে হবে, তা নয়। সাধারণ মানুষ সাধারণভাবে বুঝবে। কিন্তু আলেমগণ সাধারণভাবে বুঝলে হবে না। তাদের গভীরভাবে ও পূর্ণমাত্রায় বুঝতে হবে। কারণ, যে অন্যকে বুঝাবে তার বুঝ অধিক হতে হবে, সঠিক ও গভীর হতে হবে, তাদের মানুষকে পথ দেখাতে হবে। বাতিলের আপত্তি, সন্দেহ, সংশয় নিরসন করে মানুষের ঈমান-আমলের হেফাযত করতে হবে।

দ্বিতীয় সংশয়ের নিরসন :

দ্বিতীয় সংশয় ছিল, কুরআন-হাদীসের পর ইমামগণের ইজতিহাদও আমাদের বোঝার প্রয়োজন নেই। কারণ, আমাদের মেধাশক্তি দুর্বল। আমরা চেষ্টা করলেও তাঁদের স্তরে পৌঁছতে পারব না। অতএব তাঁদের ইজতিহাদই আমাদের মেনে চলতে হবে। তাই তা বোঝার প্রয়োজন নেই।

এর উত্তর হলো, মাযহাবের বিষয়গুলো বুঝাও কুরআন-হাদীস বুঝা বা প্রমাণিত সত্যকে বুঝার মত। প্রমাণিত সত্যকে প্রমাণ করার প্রয়োজন নাই ঠিকই, কিন্তু তার প্রমাণিত হওয়াটা বোঝার প্রয়োজন আছে। তেমনিভাবে এখন আর ইজতিহাদের প্রয়োজন নাই ঠিকই, কিন্তু ইমামগণের ইজতিহাদটা (কীসের ভিত্তিতে করেছেন, কোন দলিলের আলোকে করেছেন, এটা) বোঝার প্রয়োজন আছে। বরং এখানে বোঝার প্রয়োজন আরও বেশী। যার অনেক কারণ রয়েছে।

ইমামগণের ইজতিহাদের বুনিয়াদ ও ভিত্তিসমূহ (যেমন কিয়াস, ইস্তিহসান, উরফ, জরুরত, হাজাত ইত্যাদি) বিষয়গুলো খুব ভালো করে বুঝতে হবে। অন্যথায় ইমামগণের বক্তব্য সঠিক অর্থে বোঝাও সম্ভব হবে না এবং সঠিকভাবে প্রয়োগ করাও সম্ভব হবে না। এছাড়াও যে সকল কারণে ইজতিহাদের বুনিয়াদ ও ভিত্তি বোঝা জরুরী- মাকাসিদ ও উসূলের কিতাবাদিতে তার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। এখানে তার আলোচনা করা সম্ভব না।

মোটকথা, এখন ইজতিহাদের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে, এ কারণে ইজতিহাদী মাসআলার দলীল-ইল্লত ইত্যাদি বোঝার প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে গেছে- এমনটি মনে করা সম্পূর্ণ ভুল। অতএব বিজ্ঞ হতে হলে এক্ষেত্রেও বুঝের বিকল্প নাই।

ষোল.

বুঝে করতে হবে শরীয়ত অনুসরণ

একদল আলেমকে কুরআন-হাদীস বুঝতে হবে। শরীয়ত বুঝতে হবে। খুব ভালো করে বুঝতে হবে। না হয় উল্টো বুঝে বিপথগামী হবে। আর সাধারণদের বুঝতে হবে বিজ্ঞ হক্কানী আলেম কারা। এটা সঠিকভাবে বুঝে তাদের অনুসরণ করতে হবে। না হয় ভণ্ডদের অনুসরণ করে তারা বিভ্রান্ত হবে। অতএব প্রত্যেককেই নিজ নিজ গন্ডি থেকে বুঝতে হবে।

কিন্তু অনেকেই মনে করে যে, শরীয়ত মানাটা অন্যের চালিত গাড়িতে উঠে বসার মত। আমরা একটি গাড়িতে উঠে বসলাম, ড্রাইভার আমাকে গন্তব্যে পৌঁছে দিবে, আমার চোখ-কান খোলা রাখা, রাস্তা-ঘাট চেনার দরকার নাই। বরং আমি ঘুমিয়ে থাকলেও সে আমাকে গন্তব্যে পৌঁছে দিবে। আর এর বিভিন্ন রূপ রয়েছে। যেমন : মূর্খরা পীর-বুজুর্গের মাজারে বা দরবারে নজর-নিয়াজ দিয়ে মনে করে ভাড়া দিয়ে দিলাম। এখন ড্রাইভার আমাকে গন্তব্যে পৌঁছাবে। আর মাদরাসা-শিক্ষার পতনমুখি বর্তমান অবস্থা বলে, আমরাও যেন কোন চলন্ত গাড়িতে উঠে গিয়েছি। এখন কার আগে কে সিট দখল করতে পারে। গাড়ি তো গন্তব্যে পৌঁছবেই।

কিন্তু বিষয়টা বাস্তবে এমন নয়। আমাদের জীবনটা পরিক্ষাক্ষেত্র। আমাদের কর্মের মাধ্যমে আমরা পরিক্ষা দিয়ে চলেছি প্রতিনিয়ত। পাশ করতে হবে

কর্মগুলো শরীয়ত অনুযায়ী সম্পাদন করে। তাই আমাদের কর্মগুলো শরীয়তসম্মত হলো কিনা তা বুঝতে হবে। এবং বুঝে করতে হবে। আমরা যা করছি তাই আমাদের ধর্ম। হয়তো জান্নাত নয়তো জাহান্নাম। যাকে প্রবাদ আকারে সংক্ষেপে বলা হয়, কর্মই ধর্ম। আমার কাজ অন্যের ঘাড়ে তুলে দেয়ার বা অন্যের কাজ আমার ঘাড়ে তুলে নেয়ার কোন সুযোগ নাই। কারণ, আমার দুনিয়ার কাজটি যদি অন্য কেউ তার ঘাড়ে তুলে নেয় তখন সেটি আখেরাতের হিসাবে তার কাজ গণ্য হবে। পয়েন্টটা সে পেয়ে যাবে। আর তার কাজ যদি আমি করে দিই তাহলে সেটা আমার নেক আমলে গণ্য হবে। তাই ইরশাদ হয়েছে:

أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ 38 وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ39 (سورة النجم)

অতএব শরীয়তের বিষয়টা অন্যের গাড়ীতে চড়ে বেড়ানোর মত না। বরং তা নিজের গাড়ি নিজেই চালানোর মত। তবে আমাদের গাইড রয়েছে, রাহবার রয়েছে। তার অনুসরণ করে চলতে হবে। চোখ-কান খোলা রাখতে হবে। যেন বিপথগামী না হই। আমাদের রাহবার হলেন আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। তিনি যা করেছেন, সেটা বুঝে তাঁর মত করেই আমাদের করতে হবে। তাই আমাদের বুঝতে হবে আমরা সঠিকভাবে তাঁর অনুসরণ করছি কিনা? সঠিক পথে তাঁর পিছনে আছি কিনা?

এজন্য সঠিক উদাহরণ হলো আমরা প্রত্যেকেই নিজ গাড়ি চালাচ্ছি একজনকে অনুসরণ করে অথবা আমরা পদযাত্রী। একজনকে অনুসরণ করে হেঁটে চলছি। এখানে গাড়ীতে চড়ার মত চোখ বুজে ঘুমানো যাবে না। চোখ-কান খোলা রেখে রাহবারের অনুসরণ করতে হবে। আমাকে বুঝে-শুনে হাটঁতে হবে, হাঁটার কাজটি করতে হবে। অন্যথায় কাফেলা আমাকে ছেড়ে চলে যাবে। না হয় আমি বসে থেকে বিপথগামী হয়ে ধ্বংস হবো।

অথবা এভাবেও বলা যায় যে, কেউ আমাকে রান্না করে দিবে আর আমি খাব এমন হলে সে কীভাবে রান্না করে সেটা আমার বোঝার দরকার নাই। কিন্তু আমার যদি রান্না করে খেতে হয় তাহলে যে রান্না করতে পারে তার থেকে দেখে ভালো করে বুঝে নিতে হবে। এবং সে যেভাবে করেছে ঠিক সেভাবেই রান্না করতে হবে, অন্যথায় রান্নাও হবে না এবং সেটা খাওয়াও যাবে না। শরীয়ত মানার অর্থ বসে বসে

অন্যের হাতে খাওয়ার মত নয় বরং রান্না করে খাওয়ার মত। কারণ, শরীয়ত আমলের নাম। প্রত্যেকের নিজের আমল রয়েছে। যা তার করতে হবে।

তাই আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন দেখে, তাকে খুব সাবধানে অনুসরণ করে আমাদের চলতে হবে। এটা বিশাল একটা ব্যাপার। গোটা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের কাজ এতে অন্তর্ভুক্ত।

সাধারণ মানুষকেও জানতে হবে এবং বুঝতে হবে। তবে তারা নির্ভরযোগ্য, হক্কানী আলেমগণের নিকট থেকে জেনে আমল করবে। তাদের বিষয়টা তুলনামূলক সহজ। কিন্তু একজন আলেম নিজেও আমল করবে, সাধারণ মানুষকেও পথ দেখাবে। তাই তাকে কুরআন-হাদীস ও ফিকহ খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে। অন্যের গাড়ীতে চড়ে বেড়ানোর মত চোখ বুজে বসে থাকা যাবে না।

সতের. ছোটরাও বুঝে। তাকে বুঝিয়ে বুঝিয়ে অগ্রসর করতে হবে

তৃতীয় সংশয়ের নিরসন: তৃতীয় সংশয়টি হলো বাচ্চাদেরকে কীভাবে বোঝাবো? তাদের তো বুঝ নাই। তারা শুধু মুখস্থ করবে।

এর উত্তর হলো, বাচ্চাদেরও বুঝ আছে। আর বোঝার জন্যই আল্লাহ তাআলা চোখ, কান, নাক, অন্তর দিয়েছেন।

وَٱللَّهُ أَخۡرَجَكُم مِّنۢ بُطُونِ أُمَّهَٰتِكُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ شَيۡـٔٗا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡأَبۡصَٰرَ وَٱلۡأَفۡـِٔدَةَ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ (سورة النحل 78)

তাই তাদেরকে তাদের স্তর অনুযায়ী বোঝাতে হবে। তাদের মত করে বোঝাতে হবে। তাহলে তারা বুঝতে শিখবে এবং প্রত্যেক স্তরে বুঝে বুঝে জ্ঞানের পূর্ণতায় পৌঁছবে।

প্রতিটি স্তরেই বোঝার বিষয় আছে। বাচ্চারা যে আলিফ-বা পড়ে এখানেও বোঝার বিষয় থাকে। তাকে যদি শুধু হরফ মুখস্থ করিয়ে দেওয়া হয়, লেখার মাধ্যমে এক ফোটা, দুই ফোটা, তিন ফোটা দিয়ে বা তা ছা এর পার্থক্য বুঝিয়ে দেওয়া না হয় তাহলে সে কখনো হরফ চিনতে পারবে না। এজন্য তাকে বোঝানোর জন্য বিভিন্ন কলাকৌশল অবলম্বন করা হয়। এভাবে সে বুঝে বুঝে হরফ শিখে। এ বুঝটা এ

স্তরের জন্য অনেক বড়, অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এটাই তার জন্য কাজী হামদুল্লাহ বা বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী। এর চেয়ে কোন অংশে কম না।

এভাবে সে যখন নাহু-সরফ পড়বে তাকে সিগাহ বোঝাতে হয়, ফায়েল-মাফউল বোঝাতে হয়। বাক্যের গঠন বোঝাতে হয়। শব্দের প্রয়োগ বোঝাতে হয়। অর্থের মাঝে এর প্রভাব বোঝাতে হয়। যদি এ স্তরের সঠিক বুঝ তার মাঝে তৈরী করা না হয়। তাহলে সে সামনে অগ্রসর হতে পারবে না। তাই এ বুঝটা তার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

এরকম প্রত্যেক স্তরেরই একটা বুঝ আছে। সে স্তরের বুঝটা তার মাঝে তৈরি করে তাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। না হয় অবুঝই থেকে যাবে। তার বিদ্যা হবে মুখস্থ বিদ্যা। যা আসলে বিদ্যা নয়।

তবে তাকে তার সাধ্যের চেয়ে বেশী বোঝানো উচিত নয়। তদ্রুপ তার সাধ্যের চেয়ে কম বোঝানো ঠিক নয়। এটা তার সাথে খেয়ানত। তাই উস্তাদকে তার স্তর বুঝে সে অনুপাতে তাকে বুঝিয়ে এগিয়ে নিতে হবে।

অতএব বাচ্চারা কী বুঝবে? তাদেরকে বোঝাতে হবে না, তারা শুধু মুখস্থ করবে- এমন ধারণা অবান্তর।

আশা করি এ সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে এ বিষয়টি পরিস্কার হয়েছে যে, একেবারে প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত প্রতিটি স্তরেই বুঝের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তালিবুল ইলমদেরকে বিজ্ঞ আলেম হিসেবে গড়ে তুলতে হলে তাদেরকে প্রতিটি স্তরেই বুঝের অনুশীলন করাতে হবে, কুরআন-হাদীস ও ফিকহের গভীর বুঝ অর্জনে তাদেরকে সঠিকভাবে রাহনুমায়ী ও সহযোগিতা করতে হবে। তাহলেই তারা যোগ্য আলেম হিসেবে গড়ে উঠতে পারবে।

তবে শর্ত হলো দাওরার পর আরও পড়াশোনার ব্যবস্থা থাকতে হবে। প্রাথমিক স্তরের এ বুঝ যা দাওরা পর্যন্ত মেহনত করে তৈরি করা হবে তা দিয়ে প্রাথমিক স্তরের একজন শিক্ষক হওয়া গেলেও দ্বীনের বুঝ ওয়ালা একজন সহীহ আলেম হওয়া যাবে না। দ্বীনের বিজ্ঞ দায়ী বা বাহক হওয়া যাবে না। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে আমার বই "উচ্চশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উম্মতের জিম্মাদারী" দেখা যেতে পারে। তা

ছাড়া আরেকটি বইও তার সাথে দেখা প্রয়োজন। যা সামনে আসবে "ইলমে দ্বীন কা সহীহ তাসাওউর" নামে।

শিক্ষাব্যবস্থা ইসলামীকরণ :

গুরুত্ব ও রূপরেখা

। মুফতী আবদুল্লাহ নাজীব হাফিযাহুল্লাহ ।

মক্কার প্রথম মাদরাসা ও মক্কার ঘোষণা

শিক্ষাব্যবস্থাকে ইসলামীকরণের সূচনা

ইসলামের প্রথম অহী 'পড় তোমার রবের নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন'। তাই ইলমের স্থান ইসলামে সর্বাগ্রে। ইলম ও ইসলাম দেহ-আত্মার মতই একাকার হয়ে আছে। সুতরাং ইসলাম যেমন সর্বজনীন, ইলমও তেমন সর্বজনীন। অহীর পাশাপাশি জাগতিক-মহাজাগতিক জ্ঞানও ইসলামী ইলমের অংশ। বরং জাগতিক-মহাজাগতিক বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার প্রতি ইসলাম যে প্রেরণা দিয়েছে অন্য কোনো ধর্ম কখনোই তা দেয়নি।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের দাওয়াত ও শিক্ষা এক সাথেই শুরু করেছেন। তিনি দাওয়াতের মাধ্যমে তাওহীদের প্রতি আহ্বান করতেন। যারা ঈমান গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করত তাদেরকে ঈমান ও আমলের শিক্ষা-

দীক্ষা দিতেন। হযরত আরকাম ইবনু আবিল আরকাম আলমাখযূমী রা.-এর বাড়ি ছিলো তাদের মিলনস্থল ও মাদরাসা। (আখবারু মাক্কাহ ওয়ামা ফীহা মিনাল আছার: মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ আল-আযরাকী ২/২৬০, প্র. দারুল আন্দালুস, বৈরুত।) এখান থেকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যৌথশিক্ষা কার্যক্রম শুরু করেন। তাই ইতিহাসে মক্কার সর্বপ্রথম মাদরাসা হিসেবে খ্যাতি লাভ করে 'দারুল আরকাম'।

দারুল আরকাম মাদরাসার মাধ্যমে শিক্ষার এক নতুন ইতিহাসের সূচনা হয়। শুরু হয় ইসলামের সর্বজনীন শিক্ষা। মানুষের দৈহিক-আত্মিক সফলতা এবং পরিবার-সমাজ ও রাষ্ট্রের অগ্রগতি-উন্নতির ইসলামী শিক্ষার যাত্রা এখান থেকেই।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শিক্ষাব্যবস্থা ছিলো অহীভিত্তিক। অহী তথা কুরআন-সুন্নাহই ছিলো তাঁর শিক্ষাদর্শনের কেন্দ্রবিন্দু। তাই তিনি অহীকে মূলভিত্তি করে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করেন। তবে তিনি তৎকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞানকে অস্বীকার করেননি। বরং সেগুলোকে ইসলামীকরণ করেছেন। যতটুকু অহীসম্মত ও কল্যাণকর ততোটুকু গ্রহণ করেছেন এবং নতুন ইসলামী রূপ দিয়েছেন। আর যা আপত্তিকর তা নিষিদ্ধ করেছেন।

এভাবে ইসলামীকরণের মাধ্যমে জীবন ও শিক্ষাব্যবস্থায় নতুন প্রাণ সঞ্চার হয়েছে; জাহিলিয়্যাত ও দুনিয়ামুখী প্রবণতা হয়েছে ইসলামমুখী; শিক্ষা ও সভ্যতায় দু'মুখী নীতির সহাবস্থান বাতিল আখ্যায়িত হয়েছে। পরিসমাপ্তি ঘটেছে জ্ঞানের ধর্মীয় ও জাগতিক বিভাজন ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ কার্যক্রমের মাধ্যমে একটি নীতি স্বীকৃতি লাভ করে। অর্থাৎ خذ ما صفا ودع ما كدر [স্বচ্ছ ও উন্নত গ্রহণ করো, নোংরা ও পরিত্যাজ্য বর্জন করো।] এ নীতিটি ইসলাম বহির্ভূত যা কিছু আছে তা গ্রহণ-বর্জন করার অন্যতম মাপকাঠি। যেখানেই ইসলাম অহীবহির্ভূত কোনো বাস্তবতার সম্মুখিন হয়েছে, সেখানেই এ নীতির প্রয়োগ হয়েছে। এ নীতি আজও আছে, কিয়ামত অবধি থাকবে। ইনশাআল্লাহ।

জাগতিক ও মহাজাগতিক বিজ্ঞানকে ইসলামীকরণ

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ আদর্শ অনুকরণে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে হাজারো মাদরাসা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার আলোকেই এ সকল প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা দেয়া হতো। হোক তা কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা অথবা জাগতিক ও মহাজাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা। এখানে একজন আলেম আর একজন বিজ্ঞানীর মাঝে না বেশ-ভূষায় পার্থক্য হতো; না ইখলাছ ও লিল্লাহিয়্যাতের মাঝে। বিষয় ভিন্ন হলেও সবার ধর্ম এক, আদর্শও এক। এখানেই ইসলামের স্বকীয়তা ও সফলতার রায (রহস্য) নিহিত রয়েছে।

মুসলমানগণ প্রয়োজনে অন্যদের কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করেছেন। দর্শন ও বিজ্ঞানে অন্যদের শিষ্যত্বও গ্রহণ করেছেন। তবে সবকিছু করেছেন ইসলামের স্বকীয়তা সমুন্নত রেখে এবং অন্যদের সভ্যতা থেকে নিজেদেরকে দূরে রেখে। ইসলামের অমোঘ নীতি (স্বচ্ছ ও উন্নত গ্রহণ করো, নোংরা ও পরিত্যাজ্য বর্জন করো) অবলম্বন করে।

তারা অন্যদের দর্শন ও বিজ্ঞানের পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। তবে গবেষণা করেছেন নিজেদের মত করে। এমনকি নিজেদের প্রচেষ্টা ও নিরলস গবেষণার মাধ্যমে অন্যদের সে পদ্ধতিতে আমূল পরিবর্তন এনেছেন। আবিষ্কার করেছেন নতুন পদ্ধতি ও নীতিমালা। ঢেলে সাজিয়েছেন সবকিছু নিজেদের মত করে, ইসলামের মত করে।

যেমন, গ্রীক দর্শন ও বিজ্ঞান মুসলমানগণ গ্রহণ করেছেন। তবে নিজেরা গ্রীক জাতির কাছে বিলীন হয়ে যাননি। বরং তাদের দর্শন ও বিজ্ঞানকে ইসলামীকরণ করেছেন। নিজেদের প্রজ্ঞা ও প্রচেষ্টা দ্বারা দর্শন ও বিজ্ঞানকে এত বেশি সমৃদ্ধ করেছেন যে, মনে হবে এ দর্শন ও বিজ্ঞান ইসলামেরই আবিষ্কার।

খলীফা মামুন (২১৮হি./৮৩৩ঈ.) ৮৩০ খৃষ্টাব্দে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার জন্য বায়তুল হিকমাহ একাডেমী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর যুগে কুরআন- হাদীসের পাশাপাশি জাগতিক ও মহাজাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা এতই ব্যাপক ও সর্বজনীন ছিলো যে, তার যুগকে ঐতিহাসিকগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বর্ণযুগ বলে আখ্যায়িত করেছেন। যেমন আমীর আলী বলেন,

Mamun's reign was unquestionably the most brilliant and glorious of all in the history of islam...Mamun's caliphate constitues the most glorious epoch in saracenic history and has been justly called the `Augustan Age' of Islam.

The twenty years of his reign have left enquiring monuments of the intellectual development of the moslems in all directions of thought.

[মামুনের শাসনকাল প্রশ্নাতীতভাবে ইসলামের ইতিহাসে সর্বাধিক উজ্জল ও মহিমান্বিত যুগ। ... মামুনের খিলাফাতকাল ছিলো আরব ইতিহাসে সবচে' গৌরবময় যুগ। তার সময়কালকে যৌক্তিকভাবে মুসলিম ইতিহাসে 'আগাস্টান যুগ' বলা হয়েছে (অর্থাৎ ইউরোপের ইতিহাসে আগাস্টাস (রোমান সাম্রাজ্যের প্রথম সম্রাট) এর শাসনকাল যেমন ছিলো- অনুরূপ।)।

তার বিশ বছরের শাসনামলে চিন্তার সকল ক্ষেত্রে মুসলমানদের বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়ন বিকাশের কীর্তিস্তম্ভ রেখে গিয়েছিলো।] (A short History of the Saracens: Ameer Ali, (London-1961), p-278.)

ঐতিহাসিকগণ মানতে বাধ্য হয়েছেন যে, মুসলমানরা গ্রীকদের কাছ থেকে নিয়েছিল এক ফোঁটা; কিন্তু তাদের নতুন গবেষণা ও আবিষ্কারে তা পরিণত হয়েছিল সমুদ্রে। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও দার্শনিক আল্লামা শিবলী নুমানী রাহ. সুন্দরই বলেছেন।

مسلمانوں نے جن علوم کی اشاعت کی ان میں سے کچھ ان کے ذاتی علوم ہیں جو خود انھوں نے ایجاد کئے، یا خاص طرح پر ان کو ترتیب دیا، کچھ ایسے ہیں جو دوسری قوموں سے حاصل کیے، اور پھر ایسی ترقی دی کہ گویا انھیں کے ایجادات سے ہیں۔

"মুসলিম জাতি যে সব জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচার করেছেন তন্মধ্যে কিছু তাদের নিজস্ব গবেষণা ও উদ্ভাবনকৃত। আর কিছু অমুসলিমদের থেকে গৃহীত। তবে তারা এতে এমন উৎকর্ষ সাধন করেছেন, যেন তা মুসলমানদেরই আবিস্কার।" (মাকালাতে শিবলী- মাওলানা শিবলী নুমানী পৃ. ৪, ২০-২১ প্র. দারুল মুসান্নিফীন শিবলী একাডেমী।)

তিনি আরও বলেন,

مسلمانوں نے ایک ذرہ پایاتھا اور اس کو آفتاب بنادیا، ہیئت کو بہت کچھ ترقی دی، طبعیات کے متعلق ارسطو کی بہت سی غلطیاں دریافت کیں، منطق کو بالکل نئے طرز سے ترتیب دیا، اور چند اصول اضافہ کیے، نئےنئے آلات رصدیہ ایجاد کیے، نور کی رفتار دریافت کی، علم مناظر میں انعکاس کا قاعدہ معلوم کیا، جبر ومقابلہ جو چند جزئی مسئلوں کا نام تھا انھیں کی طباعی سے ایک علم کے رتبہ پر پنہج گیا، دواسازی، نسخوں کی تربیب، عرق کھینچنے کےآلے، موالید ثلاثہ کی تحلیل، تیزابوں کے فرق باہمی اور مشابہت کا امتحان، انھیں کی ایجادات سے ہیں، کیمسٹری کی انھیں نے بنیاد ڈالی، علم نباتات میں اپنے تجربوں سے دوہزار پودے اور اضافہ کردئے، غرض آج یونانی وعربی تصنیفات کا کوئی شخص اگر موازنہ کرے تو قطرہ ودریا کا فرق پائےگا۔

“মুসলমানরা পেয়েছেন এক কণা আর তা সমৃদ্ধ করে সূর্যে পরিণত করেছেন। উন্নত ও উৎকর্ষিত করেছেন জ্যোতির্বিজ্ঞানকে। পদার্থ বিজ্ঞানে এরিস্টটলের অনেক ভুলের চিহ্নিত করেছেন। মান্তেক, যুক্তিশাস্ত্রকে নতুন করে রূপায়িত করেছেন। সংযোজন করেছেন আরও কিছু নীতিমালা। নতুন নতুন অনুবেক্ষণ যন্ত্র আবিস্কার করেছেন। আলোর গতি আবিস্কার করেছেন। আবিস্কার করেছেন আলোকবিজ্ঞানে আলোর প্রতিফলনের নীতি ও শ্রেণীবিভাগ। এলজেবরা/বীজ গণিত যা সামান্য কয়েকটি বিষয়ে সীমাবদ্ধ ছিলো মুসলমানদের গবেষণার ফলেই তা একটি শাস্ত্রীয় রূপ পরিগ্রহ করে। তাছাড়া ঔষধ প্রস্তুত, পেসক্রিপশন ব্যবস্থাপনা বিন্যাসকরণ, পেশার পরিমাপযন্ত্র আবিস্কার করেছে। প্রাণী, উদ্ভিদ ও জড়বস্তুর চুলচেরা বিশ্লেষণ, বিভিন্ন প্রকৃতির এসিডের পারস্পরিক পার্থক্য নির্ণয় এবং সাদৃশ্যতার নিরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ মুসলিমদের হাতেই হয়েছে। আর রসায়ন তো মুসলামনদেরই আবিস্কার। উদ্ভিদ শাস্ত্রের উপর নিজেদের অভিজ্ঞতালব্ধ গবেষণার আলোকে আরও দুই হাজার উদ্ভিদ সংযোজন করেছেন।

মোটকথা হলো, গ্রীক ও আরবীয় রচনাবলী নিয়ে কেউ তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে বিন্দু ও মহাসমুদ্রের তফাৎ দেখতে হবে।] (প্রাগুক্ত)

সর্বোপরি, মুসলমানগণ দর্শন ও বিজ্ঞান শিক্ষা ইসলামীকরণে সক্ষম হয়েছিলেন।

মুসলমানদের এ কৃতিত্বে সারা বিশ্ব প্রভাবিত হয়েছিলো। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে জ্ঞানপিপাসুরা মুসলমানদের এ সকল প্রতিষ্ঠানে আসতে থাকে। এ সময় ইউরোপের অনেক ইহুদি-খ্রিস্টান মুসলমানদের প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়েছে এবং

সম্পূর্ণ ইসলামী ব্যবস্থাপনায় মুসলমানদের থেকে দর্শন ও বিজ্ঞান অর্জন করেছে। স্পেনসহ ইসলামী ভূখণ্ডের একাধিক প্রতিষ্ঠানের এমন গৌরবময় সাফল্য অর্জন রয়েছে। এ ধারার উত্তম নমুনা ছিলো, বর্তমান মরক্কোর জামিআতুল কারাবিয়্যীন।

মুসলিমদের প্রতিষ্ঠানে ইউরোপীয়দের জ্ঞানার্জন

জামিআতুল কারাবিয়্যীন প্রতিষ্ঠা লাভ করে ২৪৫ হিজরী মোতাবেক ৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে। উচ্চতর জ্ঞানচর্চার জন্য ফাতেমা বিনতে মুহাম্মাদ ফিহরী কায়রাওয়ানী নামের এক মহিয়সী নারী এই প্রতিষ্ঠানটি নির্মাণ করেছিলেন।(জামিউল কারাবিয়্যীন: ড. আবদুল হাদী তাযী ১/ ৪৬-৪৭ প্র. দারু নাশরিল মা'রিফা, মরক্কো।) অল্পদিনেই প্রতিষ্ঠানটির সুখ্যাতি দুনিয়াজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে।

এ জামিআর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, এখানে মুসলমানরা কুরআন-হাদীসের ইলম শিক্ষার্জনের পাশাপাশি দর্শন ও বিজ্ঞান অর্জন করতে পারতেন। জাগতিক ও মহাজাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা হতো পূর্ণ ইসলামী ব্যবস্থাপনায়। এ জামিআতেই ইবনে রুশদ ও ইবনুল আরাবীর মত অনেক দার্শনিক, বিজ্ঞানী, ফকীহ, কাযী, মুহাদ্দিস ও মুফাসসির শিক্ষা লাভ করেছেন।

শিক্ষাব্যবস্থা ইসলামী হওয়াতে এখানে নিয়্যাত, ইখলাছ, নৈতিকতা ও ধর্মীয় মূল্যবোধে ইবনে রুশদের মত দার্শনিক আর ইবনুল আরাবীর মত মুহাদ্দিসের মাঝে পার্থক্য ছিলো না।

জ্ঞান চর্চায় এটি ইসলামের অনন্য বৈশিষ্ট্য। জামিআ কারাবিয়্যীনে যখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা হচ্ছে তখন পুরো ইউরোপজুড়ে কোনো জামিআ বা ইউনিভার্সিটি ছিলো না। সুতরাং জামিআ বা ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মুসলমানরাই প্রাগ্রসর। স্বয়ং ইউরোপীয়রাই এর স্বীকৃতি দিয়েছে। জামিআতুল কারাবিয়্যীনের ইতিহাসবিদ ড. আবদুল হাদী আততাযী বলেন,

إذا عرفنا أن جامعة بولونية بإيطالية أسست سنة 1158، وجامعة السوربون عام 1200، وأعقبتها أوكسفورد وسلامنكا، قدرنا إذن ما تضافرت عليه نقول بعض الأساتذة والمستشرقين والمؤرخين الأجانب ممن كتبوا في شأن فاس.

فقد كتب الأستاذ ديلفان منذ زهاء قرن، يقول : لقد كانت مدينة فاس بحق دار العلم بالمغرب، وتعد جامعة القرويين فيها أول مدرسة في الدنيا.

وكتب المستشرق الروسي جوزي منذ ثلاثة أرباع القرن يقول : إن أقدم كلية في العالم ليست في أوربا كما كان يظن، بل في إفريقيا في مدينة فاس عاصمة المغرب...

وقال ...الاخوان جان وجيروم طارو..: في هذه القرويين حيث كانت تزدهر علوم الميقات وفن الجبر، في وقت لم يعتن أحد فيه بهذيه الفنين....

وقال الأستاذ روم لاندو : وقد شيد في فاس منذ أيامها الأولى جامع القرويين الذي هو أهم جامعة وأقدمها، وفي القرويين هنا كان العلماء منذ حوالي ألف سنة يعكفون على المباحث الدينية والمناظرات الفلسفية التي قد تتجاوز دقتها إدراك فكرنا الغربي، وكان المثقفون يدرسون التاريخ والعلوم والطب والرياضيات، ويشرحون أرسطو وغيره من مفكري الإغريق..

“যদি আমরা জানি, ইটালির বুলোনা (BLOGNA) ইউনিভার্সিটি ১১৫৮ খ্রি. সোরবোন (প্যারিস) ১২০০ অব্দে এবং অক্সফোর্ড ও সালামাঙ্কা স্পেন) ইউনিভার্সিটি তারও পরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাহলে আমরা বুঝতে পারবো, মরক্কোর ‘ফাস’ (FEZ) এর ব্যাপারে প্রাচ্যবিদ ইতিহাসবিদ ও গবেষকদের অনেকে যা উল্লেখ করেছেন তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রফেসর ডেলকান এক যুগ আগেই লিখেছেন, ‘ফাস’ শহর বাস্তবেই মরক্কোর অনন্য জ্ঞানকেন্দ্র ছিল। সেখানকার কারাবিয়্যীন ইউনিভার্সিটি পৃথিবীর বুকে সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত ভার্সিটি।

রুশ প্রাচ্যবিদ জোসি অর্ধযুগ পূর্বেই লিখেছেন, বিশ্বের প্রাচীনতম কলেজ ইউরোপে নয় যেমনটি ধারণা করা হতো। বরং আফ্রিকায়; মরক্কোর রাজধানী শহর ‘ফাস’-এ। জন ও জেরম বলেন, এ কারাবিয়্যীনে ঐ সময় ইলমুল মীকাত ও বীজগণিত উৎকর্ষলাভ করছিলো, যখন পৃথিবীতে অন্য কোথাও এ দু’ শাস্ত্রে কাজ হচ্ছিলো না।

প্রফেসর ‘রম ল্যান্ড’ (ROM LANDAU) বলেন, ফাস শহরের আদিকালেই সেখানে জামিউল কারাবিয়্যীন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও সবচে প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়। কারাবিয়্যীন এ দু হাজার বছর ধরে স্কলারগণ ধর্ম ও দর্শন নিয়ে এমন আলোচনা-সমালোচনা ও তর্ক-বিতর্ক করে আসছেন, যার সুক্ষতা হয়তো পাশ্চাত্য

বুদ্ধিবৃত্তিকে ছাড়িয়ে যাবে। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস, বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান ও গণিত চর্চা করা হতো। এরিস্টটল ও গ্রীকের অন্যান্য দার্শনিকদের দর্শন পাঠ ও বিশ্লেষণ করা হতো।" (জামিউল কারাবিয়্যীন ১/১১৪)

হাজার হাজার ইউরোপের ছাত্র এ জামিআমুখী হয়। উদ্দেশ্য, দর্শন ও বিজ্ঞান শিক্ষালাভ করা। তারা মুসলমানদের কাছে ইসলামী ভাবধারাতেই শিক্ষালাভ করত। এ জামিআর অনেক বিধর্মী ছাত্র পরবর্তীতে স্ব-ধর্ম ও জাতির মাঝে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। এমনকি এ জামিআর একজন ছাত্র খ্রিস্টানদের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা 'পোপ' নিযুক্ত হয়েছিল। এটা আমাদের নিছক দাবি নয়। বরং ইউরোপীয়রাই তা স্বীকার করেছে। ড. আবদুল হাদী তার উপরোক্ত গ্রন্থে উল্লেখ করেন,

قال الأستاذ جوزي كريستوفيتش : إن أقدم مدرسة كلية في العالم أنشئت لا في أروبا كما كان يظن، بل في إفريقية، في مدينة فاس عاصمة بلاد المغرب سابقا، إذ قد تحقق بالشواهد التارخية أن هذه المدرسة كانت تدعي كلية القرويين، قد أسست في الجيل التاسع للميلاد، وعليه فهي ليست فقط أقدم كليات العالم، بل هي الكلية الوحيدة التي كانت تتلقى فيها الطلبة العلوم السامية في تلك الأزمنة، حينما لم يكن سكان باريز واكسفورد وبارو وبولونيا يعرفون من الكليات إلا الاسم، فكانت الطلبة تتوارد على كلية القيروان من أنحاء أروبا وإنكلترا فضلا عن بلاد العرب الواسعة للانخراط في سلك طلابها، وتلقى العلوم السامية باللغة العربية مع الطلبة الطرابلسيين والتونسيين والمصريين والأندلسيين وغيرهم، ومن جملة من تلقى علومه في هذه الكلية من الأوربيين جيربرت أو البابا سيلفيستر، وهو أول من أدخل إلى إوربا الأعداد العربية وطريقة الأعداد المألوفة عندنا بعد أن أتقنها جيدا في الكلية المذكورة...

"অধ্যাপক জোসি ক্রিস্টোভিচ বলেন, দুনিয়ার প্রথম কলেজ ইউরোপে প্রতিষ্ঠা করা হয়নি, যেমনটি ধারণা করা হতো। বরং আফ্রিকাস্থ মরক্কোর প্রাচীন রাজধানী ফাস এ প্রথম কলেজ খোলা হয়।

ইতিহাস সাক্ষী, কারাবিয়্যীন কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে নবম খ্রিস্টাব্দে। এ হিসেবে এটি শুধু বিশ্বের প্রাচীনতম কলেজই নয়; বরং সে যুগে এটিই একমাত্র কলেজ ছিল যেখানে শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষা লাভ করতো। তখন প্যারিস অক্সফোর্ড , পেরু ও বুলোনার অধিবাসীরা কলেজ-ভার্সিটির নাম ছাড়া আর কিছু জানত না। আরববিশ্ব ছাড়াও ইউরোপ ও ইংল্যান্ডের আনাচ-কানাচ থেকে শিক্ষার্থীরা এই কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য ছুটে আসত। এখানেই তারা ত্রিপলি, তিউনিস, মিশর ও ইন্দোনেশিয়ার

শিক্ষার্থীদের সাথে উচ্চশিক্ষা লাভ করত। এ কলেজের ইউরোপীয় শিক্ষার্থীদের মধ্যে জার্বার্ট (এঊজইঊজঞ) তথা পোপ সিভেস্টার উল্লেখযোগ্য। ইনিই সর্বপ্রথম ইউরোপে আরবী সংখ্যা এবং প্রচলিত সংখ্যাপদ্ধতি নিয়ে আসেন। যা তিনি উক্ত কলেজে ভালোভাবে রপ্ত করে নিয়েছিলেন।" (জামিউল কারাবিয়্যীন ১/১১৫।)

বিস্তারিত জানার জন্য ড. আব্দুল হাদী আততাযী-র'জামেউল কারাবিয়্যীন' নামের তিন খণ্ডের কিতাবটি দেখা যেতে পারে।(আফসোসের বিষয় হলো, ইফা থেকে প্রকাশিত ইসলামী বিশ্বকোষে এ জামিআর নাম উল্লেখ থাকলেও জামিআ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়নি।)

ইউরোপের প্রতি মুসলমানদের এ অবদান অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। কেউ কেউ অস্বীকার করার ধৃষ্টতা দেখালেও অনেকেই অকপটে তা স্বীকার করেছেন।

আধুনিক যুগের ইসলামী দার্শনিক ও কবি মুহাম্মাদ ইকবাল (১৯৮৩ঈ.) স্বীয় গ্রন্থ 'রিকন্সট্রাকশন অব রিলিজিয়াস থট ইন ইসলাম' এ আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন,

'বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ইসলামিক গোড়াপত্তনের কথা বিলম্বে হলেও ইউরোপ অবশেষে স্বীকার করেছে। ব্রিফল্টের 'মেকিং অব হিউম্যানিটি' নামীয় পুস্তক থেকে আমি এখানে দু'একটি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করছি,

মুসলিম দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের অক্সফোর্ডস্থ উত্তরাধিকারিগণের নিকটেই রজার বেকন আরবী এবং আরবীয় বিজ্ঞান শিখেছিলেন। তিনি অথবা তাঁর সম-নামীয় বৈজ্ঞানিক কেউই পরীক্ষামূলক পদ্ধতি প্রবর্তনের কৃতিত্বের অধিকারী নন। রজার বেকন ইউরোপে মুসলিম বিজ্ঞান ও পদ্ধতি প্রবর্তনের কৃতিত্বের অধিকারী নন। রজার বেকন ইউরোপে মুসলিম বিজ্ঞান ও পদ্ধতির একজন প্রচারক ছাড়া অধিক কিছু ছিলেন না। তিনি এ কথা প্রচার করতে কখনও দ্বিধাবোধ করেননি যে, তাঁর সমসাময়িকদের পক্ষে জ্ঞান অর্জনের একমাত্র পথ হচ্ছে আরবী, এবং আরবীয় বিজ্ঞান শিক্ষা পরীক্ষামূলক পদ্ধতির প্রবর্তক কে ছিলেন, এ নিয়ে বিতর্ক ইউরোপীয় সভ্যতার আদি সম্বন্ধে যে বিরাট ভুল করা হয়, তারই একটা অংশ মাত্র।

বেকনের সময়ে আরবদের পরীক্ষামূলক পদ্ধতি সমগ্র ইউরোপে প্রচার লাভ করেছিল এবং আগ্রহের সাথে অনুশীলিত হতো।

বিজ্ঞান হচ্ছে আধুনিক পৃথিবীতে আরব সভ্যতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান, কিন্তু এর ফল পরিপক্ক হয়েছিল বিলম্বে। মূর-সংস্কৃতি অন্ধকারের গর্ভে তলিয়ে যাবার অনেক দিন পর তার গর্ভজাত এই বিজ্ঞান সন্তানটি পূর্ণ শক্তি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। কেবলমাত্র বিজ্ঞানই ইউরোপের প্রাণসঞ্চার করেনি। ইসলামী সভ্যতার অন্যান্য এবং বহুমুখী প্রভাব আধুনিক ইউরোপীয় জীবনের প্রথম উদ্দীপনা এনে দিয়েছিল।'

'যদিও ইউরোপীয় প্রগতির এমন একটা ক্ষেত্র নেই যেখানে ইসলামের তামাদ্দুনিক প্রভাবের সুনিশ্চিত নিদর্শন না মিলে, তবু প্রকৃতি-বিজ্ঞান এবং ইউরোপের বৈজ্ঞানিক মনোভাবের জাগরণের মতো আর কোন কিছুতেই এই প্রভাব এত সুস্পষ্ট আর গুরুত্বপূর্ণ নয়। আর এই প্রকৃতি-বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক মনোভাবই আধুনিক জগতের স্থায়ী ও বিশিষ্ট শক্তি এবং তার জয়ের মূল উৎস।'

'আরবীয় বিজ্ঞানের কাছে আধুনিক বিজ্ঞান শুধু যুগান্তকারী মতবাদের আবিষ্কারের জন্যে ঋণী নয়; আরবীয় তমদ্দুনের নিকট আধুনিক বিজ্ঞান এর চেয়েও বেশি ঋণী : বিজ্ঞানের জন্মই হয়েছে আরব-সংস্কৃতির বুকে। আমরা দেখেছি, প্রাচীন জগত ছিল প্রাক-বৈজ্ঞানিক। গ্রীকদের জ্যোতির্বিদ্যা এবং গণিত ছিল বিদেশ থেকে আমদানী করা বস্তু এবং এগুলোর সাথে কখনই গ্রীক সংস্কৃতির পুরোপুরি সামঞ্জস্য হয়নি। বিধিবদ্ধকরণ (systematization) সামান্যকরণ (Generalization) এবং তত্ত্বীকরণ (Theorization) গ্রীকরা করেছিল, কিন্তু ধৈর্যের সঙ্গে গবেষণা, প্রত্যক্ষ জ্ঞানের আহরণ, বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম পদ্ধতির পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক পুংখানুপুংখ ও দীর্ঘায়িত অনুসন্ধান- এসব ছিল গ্রীক প্রকৃতির সম্পূর্ণ প্রতিকূল। প্রাচীন যুগে বিজ্ঞান-চর্চা এক-আধটু হয়েছিল গ্রীক আমলের আলেকজান্দ্রিয়ায়। যাকে আমরা বিজ্ঞান বলি, ইউরোপে তার বিকাশ হয় একটা নতুন অনুসন্ধিৎসার ফলে; গবেষণার নতুন পদ্ধতি, পরীক্ষা পর্যবেক্ষণ ও পরিমাণের পদ্ধতি এবং গণিতের বিকাশের ফলে। এ-সবই ছিল গ্রীকদের অজ্ঞাত।

ইউরোপে এ-সবের প্রেরণা এনে দিয়েছিল আর এসব পদ্ধতির প্রবর্তন করেছিল আরবরাই।'(ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন: ড. মুহাম্মদ ইকবাল, পৃ. ১৭১-১৭২, ইসলামিক ফাউন্ডেশন।)

রবার্ট ব্রিফল্ট যথার্থই বলেছেন,

'ইউরোপের উন্নতি-অগ্রগতির এমন কোনো অঙ্গন নেই যেখানে ইসলামী সভ্যতার বিরাট অবদান নেই। বস্তুত ইউরোপীয় জীবনের উপর ইসলামের বিপুল প্রভাবক ভূমিকা রয়েছে।'(মুসলিম উম্মাহর পতনে বিশ্বের কী ক্ষতি হলো?: সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নাদাবী পৃ. ২৩৪ প্র. দারুল কলম আশরাফাবাদ, ঢাকা)

মুসলিম উম্মাহর পতন ও ইউরোপীয়দের উত্থান

ইসলামী খেলাফতের পতন আর মুসলিম উম্মাহর অধঃপতনের ফলে জ্ঞানের ময়দানের নেতৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ চলে যায় ইউরোপীয়দের হাতে। তারা পূর্ণ উদ্যম ও স্পৃহা নিয়ে বিজ্ঞান চর্চায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রকৃতি বিজ্ঞান ও মহাজাগতিক বিজ্ঞানকে সার্বিকভাবে গবেষণা ও গ্রন্থনা দ্বারা সুসমৃদ্ধ করে তোলে। তারা নতুনত্ব ও সৃজনশীলতায় এত অগ্রগামী হয় যে, মুসলমানদের অবদান ছাপিয়ে যায়। তারাই বিজ্ঞানে সর্বেসর্বার রূপ ধারণ করে।

তারা দীর্ঘ নিদ্রা থেকে জেগে উঠে। পৃথিবী ও জীবনকে নিয়ে নতুন করে ভাবতে থাকে। জন্ম দেয় অভিনব বিভিন্ন মতবাদের। এর মাঝে সবচেয়ে ভয়ংকর মতবাদ হলো চারটি- কমিউনিজম, ক্যাপিটালিজম, সেক্যুলারিজম ও ফ্যাসিজম। ইউরোপিয়রা দু'মুখী শিক্ষাব্যবস্থায় যেহেতু বিশ্বাসী নয় তাই যখন তারা কোনো একটি মতবাদ গ্রহণ করেছে তখন নিজেদের শিক্ষাব্যবস্থাকে সেভাবে সাজিয়েছে। শিক্ষাকে মাধ্যম ধরেই নিজেদের মতবাদ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চালিয়েছে এবং সফলও হয়েছে।

এভাবে ইউরোপীয়দের উত্থানের ফলে নতুন নতুন শিক্ষাবিজ্ঞান জন্ম নেয়। ক্রমান্বয়ে মুসলিমরা তাদের দ্বারস্থ হয়ে পড়ে। অনেকটা বাধ্য হয়েই নিজেদের প্রতিষ্ঠানে তাদের শিক্ষাবিজ্ঞান গ্রহণ করতে হয়।

ইউরোপীয়দের শিক্ষাবিজ্ঞান : প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

ইউরোপীয় শিক্ষাব্যবস্থা প্রকৃতি জানার জন্য ইউরোপীয়দের উত্থানের কারণ ও প্রেক্ষাপট জানা-ই যথেষ্ট। ইউরোপীয়দের উত্থান হয়েছিলো, বিশ্বাস আর ধর্মের বলয় থেকে মুক্ত হওয়ার লক্ষ্যে। তারা খ্রিস্টধর্মের সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হয়ে বস্তুবাদের ফ্রেমে আবদ্ধ হয়ে যায়। তাদের ফিতরাহ ও বিশ্বাস চলে যায় বিজ্ঞানের নিয়ন্ত্রণে। তাদের বিশ্বাস হয়ে যায় লাগামবদ্ধ উটের মত, বিজ্ঞান যেখানে চায় নিয়ে যেতে পারে।

তারা ধর্মকে বিলুপ্ত করতে চেয়েছিলো; কিন্তু সক্ষম হয়নি। কীভাবেই বা হবে? মানবকে বাঁচিয়ে রেখে তার প্রকৃতিকে নির্মূল করা যায় না। ধর্ম মানব প্রকৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। অবশেষে তারা ধর্মকে সমাজ, রাষ্ট্র ও পৃথিবী থেকে আলাদা করে। ধর্মকে বানিয়ে দেয় 'পার্সোনাল ম্যাটার' বা ব্যক্তিগত বিষয়। নিছক ব্যক্তিগত প্রশান্তির জন্য কেউ চাইলে ধর্ম মানতে পারে। এর বাইরে ধর্মের কোনো প্রভাব নেই।

তারা নিজেদের এ নীতি ও মতাদর্শের আলোকে জীবন, পরিবার ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রণয়ন করে এবং নিজেদের শিক্ষাব্যবস্থা সাজিয়ে নেয়।

ইউরোপ মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে, শিক্ষাব্যবস্থা আমদানী-রপ্তানীর বিষয় নয়। বরং প্রত্যেক দেশের শিক্ষাব্যবস্থা হবে সে দেশের প্রকৃতি, সমাজ, চাহিদা ও প্রবণতাকে কেন্দ্র করে। তারা এক মতাদর্শের ধারক বাহক হয়ে অন্য মতাদার্শের শিক্ষাব্যবস্থা গ্রহণ করে না।

সোভিয়েত রাশিয়া বাক-স্বাধীনতা ও মত প্রকাশে স্বাধীনতার বড় প্রবক্তা। তাই কোনো ধর্ম বা কোনো মতাদর্শের বাধ্যবাধকতা সেখানে না থাকা ছিলো স্বাভাবিক। কিন্তু রাশিয়ার শিক্ষানীতি পুরোটাই কমিউনিজম নীতির উপর নির্মিত। শিক্ষাব্যবস্থায় তারা এমন কোনো নীতি অনুমোদন করে না, যা পুঁজিবাদীদের হাতে তৈরী হয়েছে। কারণ এমন শিক্ষাব্যবস্থা তাদের কমিউনিজম ধ্বংসের কারণ হতে পারে। সোভিয়েত রাশিয়ার শিক্ষাবিদ গ. ঈ. এড়াবৎহ বলেন,

إن العلم الروسي ليس قسما من أقسام العلم العالمي، وإنه قسم منفصل قائم بذاته، يختلف عن سائر الأقسام كل الاختلاف، فإن سمة العلم السوفيتي الأساسية أنه قائم على فلسفة واضحة متميزة، إن التحقيقات العلمية لا تزال في حاجة إلى أساس وأن أساس علومنا الطبيعية الفلسفة المادية التي قدمها ماركس وأنجلس ولينين

وستالين، وإنا نريد أن نخوض - وفي أيدينا هذه الفلسفة - في معترك العلم الطبيعي ونصارع جميع التصورات الأجنبية التي تناهض فلسفتنا المادية والماركسية بكل حزم وقوة.

“রুশ শিক্ষাদর্শন আন্তর্জাতিক শিক্ষাদর্শনের অংশ নয়। বরং এ শিক্ষাদর্শন নিজস্ব স্বকীয়তায় অন্য সমূহ দর্শন থেকে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন ও অনন্য। কারণ, সোভিয়েত শিক্ষাদর্শনের একটি মৌলিক চরিত্র হলো, এটি একটি স্বতন্ত্র ও স্বচ্ছ দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত তথা, বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণসমূহ অবশ্যই কোনো একটি দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। আর আমাদের প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ভিত্তি হলো সেই বস্তুবাদী দর্শন, যা মার্কস, অ্যাঞ্জেলস, লেনিন ও স্টালিন পেশ করেছিলেন।

আমরা এ দর্শনকে নিয়েই প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের রণক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাই; পূর্ণ শৌর্যবীর্যে আমাদের বস্তুবাদী ও মার্কসীয় দর্শনের সাংঘর্ষিক অন্যসব ধ্যান-ধারণার মোকাবেলা করতে চাই।” (নাহওয়াত তারবিয়াতিল ইসলামিয়্যা- সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নাদাবী পৃ. ৬৪-৬৫)

এমনিভাবে পুঁজিবাদী দেশগুলো নিজেদেরকে মুক্তচিন্তার প্রবক্তা বললেও তারা নিজেদের নীতিবিরোধী কোনো শিক্ষানীতি অনুমোদন করে না। পুরো ইউরোপ আমেরিকার অবস্থা একই রকম। আল্লামা আবুল হাসান আলী নাদাবী রাহ. (১৪২০হি.) বলেন,

“এমনিভাবে পুঁজিবাদী ভাবধারায় বিশ্বাসী রাষ্ট্রগুলো যদিও ধর্মের ব্যাপারে মুক্ত চিন্তাধারা প্রচার করে এবং মুক্তভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণকে জরুরি মনে করে, তবু তারা স্বদেশে বাইরের চিন্তাধারা ও মতবাদ তথা এমন কোন শিক্ষানীতি গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয় যার দ্বারা তাদের দেশে সমাজতন্ত্র এবং চরমপন্থী কমিউনিজমের বীজ রোপিত হয়। কোন কমিউনিস্ট দেশের বিখ্যাত শিক্ষাবিদকেও তারা নিজ দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদানের সুযোগ দেয়ার চিন্তা করে না।

শুধু এতটুকুই নয়; বরং পাশ্চাত্যের শিক্ষাবিদগণ বাইরের দেশ থেকে শিক্ষাব্যবস্থা আমদানির ঘোর বিরোধী। যদিও তারা চিন্তা ও মতাদর্শের দিক থেকে যত কাছের হোক না কেন!

উদাহরণস্বরূপ ইংল্যান্ড ফ্রান্সের শিক্ষানীতি আমদানী করতে আগ্রহী নয়; ফ্রান্সও ইংল্যান্ডের শিক্ষাব্যবস্থার ধার ধারে না। অথচ উভয় রাষ্ট্র একে অপরের গভীর মিত্র। সুতরাং চিরশত্রু জার্মানীর শিক্ষাব্যবস্থা গ্রহণ করার তো প্রশ্নই উঠে না।

ভাষা, সভ্যতা-সংস্কৃতি, রাজনৈতিক মৈত্রী, প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদ- এতসব ঐক্যের দিক থাকা সত্ত্বেও মার্কিন শিক্ষাবিদগণ ব্রিটেন থেকে শিক্ষাব্যবস্থা ধার নেন না। অনুরূপ ব্রিটিশরাও মার্কিন শিক্ষানীতির কোনো প্রয়োজন অনুভব করে না। তাদের দৃষ্টিতে শিক্ষানীতি এমন বস্তু নয়, যা শিল্পপণ্য ও কাঁচামালের ন্যায় বহির্বিশ্ব থেকে আমদানী করা যায়।

প্রখ্যাত মার্কিন শিক্ষাবিদ Dr. J. B. conant তার Educacion & Liberty গ্রন্থে লিখেছেন, "শিক্ষানীতি না লেনদেনযোগ্য বস্তু; না অন্য দেশ থেকে সরবরাহ করা হয় এমন কোনো পণ্য। আমরা অতীতে ইউরোপ বা ব্রিটিশ শিক্ষানীতির যেসব বিষয় গ্রহণ করেছি, তাতে লাভের তুলনায় ক্ষতি বেশি হয়েছে।" (নেযামে তালীম- সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নাদাবী পৃ.৫৪-৫৫ প্র. সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ একাডেমী।)

এরকম আরো অনেক উদাহরণ পেশ করা যাবে। তবে এখানে আশা করি এতটুকুই যথেষ্ট।

ইউরোপীয় ইতিহাসের আলোকে তাদের শিক্ষাব্যবস্থা বিশ্লেষণ করলে সহজেই দুটি দিক ফুটে উঠে-

এক. শিক্ষা কারিকুলাম ও সিলেবাসের মাঝে জনগণের চিন্তা-চেতনার প্রতিফলন

তারা জীবন ও পৃথিবী সম্পর্কে যে চিন্তা পোষণ করে সিলেবাসে তাই পড়ে। উন্নতি ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে যা বিশ্বাস করে ক্লাসে তাই খোঁজে পায়। তাদের পরিবার ও স্কুল চিন্তা- চেতনার দিক থেকে এক ও অভিন্ন।

এ থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, তারা কখনোই দুমুখো নীতি বা সংঘাতপূর্ণ শিক্ষাব্যস্থা অনুমোদন করে না। কারণ, তারা বুঝতে পেরেছে যে, দুমুখো শিক্ষাব্যবস্থা সৃজনশীল জ্ঞানী তৈরী করবে না। বরং কিছু বিকলাঙ্গ মেধা তৈরী

করবে। তাই তারা নিজেরা নিরাপদে থেকে এই অভিশাপ মুসলিমদের উপর চাপিয়ে দেয়ার অপচেষ্টা করছে।

দুই. ভিন্ন চিন্তা ও আদর্শে গ—ে উঠা শিক্ষাব্যবস্থাকে বর্জন

নিজেদের আদর্শ বহির্ভূত বা বিরোধ কোনো শিক্ষাব্যবস্থাকেই তারা গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়, যেমনটি পূর্বে উল্লেখ হয়েছে। প্রত্যেকটি জাতির নিজস্ব স্বকীয়তা বজায় রাখতে হলে এ দু দিক গ্রহণ করার বিকল্প নেই। তাই তারা মনে-প্রাণে তা গ্রহণ করেছে। আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় উভয়টিই অনুপস্থিত। মুসলমান হয়েও সেক্যুলার শিক্ষাব্যস্থায় লেখাপড়া করতে হচ্ছে। বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে।

শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে ইউরোপীয়দের আইডোলোজিক্যাল এটাক্ট

সাম্রাজ্যবাদী চিন্তা ইউরোপীয়দের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তারা নিজেদের আদর্শ-সভ্যতার প্রচার-প্রসার ও আধিপত্য বিস্তার করার জন্য শিক্ষাব্যবস্থাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে।

নিজেদের শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে মুসলিমসহ অন্যদের উপর তারা আইডোলোজিক্যাল এটাক্ট করছে। তারা নিজেরাই বিভিন্ন প্রসঙ্গে এ উদ্দেশ্যের কথা প্রকাশ করেছে।

প্রথমে তারা মুসলিম দেশ থেকে মেধাবী ছাত্রদের উচ্চশিক্ষার নামে ইউরোপে নিয়ে যায়। কিন্তু এ কার্যক্রম প্রচুর ব্যয়বহুল ও অন্যান্য কারণে ব্যাপক সফলতার মুখ দেখেনি। তাই খ্রিস্টান মিশনারীরা একটি বৃহৎ মুসলিম জনগোষ্ঠীকে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ইসলামী রাস্ট্রগুলোতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার স্কেইম প্রস্তুত করে।

সর্বপ্রথম এ প্রস্তাব রাখেন (Danial Bilss I Wiliam Tomson)। এরাই ১৮৬১-১৮৬৩ তে ইসলামী রাষ্ট্রগুলোতে স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠার ধারা নিয়ে গবেষণা করে। উদ্দেশ্য ছিলো, একদিকে মুসলিমদের থেকে খ্রিস্ট ধর্মের প্রচারক গড়ে তোলা অপরদিকে বিরাট একটি জনগোষ্ঠীকে প্রভাবিত করা। ফলে এ পরিকল্পনা অনুসারে তুরস্ক, সিরিয়া, মিশর, লেবানন এবং ইরাকে এ ধরণের স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। সাধারণ জনগণও এসব প্রতিষ্ঠানমুখী হয়ে পড়ে। খ্রিস্টান

মিশনারীদের সুদূর দৃষ্টি ছিলো, উচ্চ পরিবার ও উচ্চ শ্রেণীর লোকদের দিকে। কারণ, রাষ্ট্রের নীতি-নির্ধারক ও নিয়ন্ত্রকরা এসব পরিবারেই জন্মগ্রহণ করে। বিষয়টি আরও স্পষ্ট করার লক্ষ্যে নিম্নে তাদের কিছু বক্তব্য উল্লেখ করা হলো,

আমেরিকান বংশোদ্ভুত প্রসিদ্ধ খ্রিস্টান মিশনারী Samuel Zweimir (১৮৬৭-১৯৫৩) ১৯২৪ঈ.তে অনুষ্ঠিত খ্রিস্টান মিশনারীদের কনফারেন্সে উত্থাপিত একটি রিপোর্টে বলেন,

‘আমাদের সবচে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, প্রতিটি পদক্ষেপেই মুসলিম নবপ্রজন্মের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা। সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা এ প্রজন্মের প্রতি নিবদ্ধ রাখা। ইসলামী রাষ্ট্রগুলোতে এ মিশনটিকে অন্য সবকিছুর উপর প্রাধান্য দেয়া। কারণ, নবপ্রজন্মের মাঝে ইসলামী ভাবধারা শৈশব থেকেই তৈরী হতে থাকে। তাই মুসলিম শিশুদের চেতনা-অনুভূতি পরিপক্ক হওয়ার আগেই তাদের পিছনে অক্লান্ত পরিশ্রম ব্যয় করতে হবে।

মি. Takle বলেন,

‘আমরা স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রতি তো মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করবই, সাথে সাথে পশ্চিমা শিক্ষার প্রতিও উদ্বুদ্ধ করব। অনেক মুসলমান এমন আছে যারা কেবল ইংরেজী শিখেই ঈমান ও ধর্ম বিশ্বাসে দুর্বল হয়ে পড়েছে। কারণ, আমাদের শিক্ষাক্রমের পাঠ্যবই পড়ে কোনো ধর্মীয় পবিত্র গ্রন্থের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখা সহজ থাকে না।

ফ্রান্সের প্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিদ Louis Massignon (১৮৮৩-১৯৬২) বলেন,

‘প্রাচ্যের যেসব শিক্ষার্থীরা ফ্রান্সে আসে তাদেরকে খ্রিস্টীয় রঙ্গে রঙ্গীন করতে হবে।

Anna Milligan একজন খ্রিস্টান মিশনারী নারী । তিনি বলেন,

‘ইসলামে কোনো রাস্তা নেই। শিক্ষাব্যবস্থাই নবপ্রজন্মকে খ্রিস্ট ধর্মের নিকটে নিয়ে যাবে এবং এর মাধ্যমে চিন্তা-চেতনায় যে প্রভাব পড়বে তা মুছে যাবে না।

ইসলামী রাষ্ট্রের সম্ভাব্য নীতিনির্ধারকরাও এ প্রভাব থেকে রেহাই পাবে না।'

প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ এইচ. এ. আর. গীব (H. A. R. Gibb) এ শিক্ষার পরিণতি ও সফলতা সম্পর্কে বলেন,

'এ সব স্কুলগুলো শিক্ষার্থীদের চরিত্রকে একটি বিশেষ রঙ্গে রঙ্গীন করেছে। তাদের ঝোঁক-প্রবণতা এবং মন-মানসিকতাকে একটি বিশেষ ধাঁচে ঢেলে সাজিয়েছে।

সবচে গুরুত্বপূর্ণ সফলতা হলো, এ সব স্কুল শিক্ষার্থীদেরকে ইউরোপীয় ভাষা শিখিয়েছে। এগুলোই সরাসরি তাদেরকে ইউরোপীয় চিন্তা-চেতনা ও জীবনব্যবস্থাকে আপন করে নিতে বাধ্য করবে।'

তিনি আরও বলেন,

"মিডিয়া ও আধুনিক স্কুলগুলোর মাধ্যমে প্রচারিত আমাদের শিক্ষা-সাংস্কৃতিক আগ্রাসন মুসলিম জনগোষ্ঠীকে এমনভাবে প্রভাবিত করেছে, ধর্মের সাথে তাদের সম্পর্ক অনেকাংশে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।"(দ্রে. নিযামে তালীম ওয়া তারবিয়াত মাওলানা ওয়াযিহ রশীদ নাদাবী রাহ. পৃ. ৩৬-৩৯। আরও জানতে দেখুন, আল্্গারাতু আলাল আলমিল ইসলামি': A lechatelier , আলফাতিকান ওয়াল ইসলাম: ড. যায়নাব আবদুল আযীয, হুছুনুনা মুহাদ্দাদাতুন মিন দাখিলিহা: ড. মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ হুসাইন, আততাবশীর ওয়াল ইস্তে'মার ফিল বিলাদিল আরাবিয়্যাহ: ড. মুস্তফা খালেদী)

তিনি অন্যত্রে বলেন,

"পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থা হলো প্রাচ্যের সভ্যতাকে পাশ্চাত্যে রুপান্তরিত করার অন্যতম একটি কার্যকরী মাধ্যম। এভাবে পশ্চিমা শিক্ষাব্যবস্থার প্রসার ঘটালে তা বর্তমান সভ্যতাকে পশ্চিমাকরণে ব্যাপক ও গভীর করতে ভূমিকা রাখবে। বিশেষ করে এর সাথে সংযুক্ত হয়েছে শিক্ষাবিষয়ক অন্যান্য কার্যকরী দিক যা মুসলিম জাতিগুলোকে পূর্বোক্ত লক্ষ্যের দিকে একযোগে ঠেলে দিবে। (মিনাত তাবাঈয়্যাতি ইলাল আছালা ফী মাজালিত তালীম: আনওয়ার জুনদী, পৃ. ৮১ প্রকাশনা: দারুল

ইতিসাম, দ্র.আততরিক ইলাল আছালা: আনওয়ার জুনদী প্র. দারুছ ছাহওয়া, কায়রো।)

ইসরাইলি গোয়েন্দা বাহিনীর পাঠ্যবই 'দ্য প্রটোকল' এ এমন অনেক চাঞ্চল্যকর বক্তব্য রয়েছে। এতে উল্লেখ হয়েছে, "তোমরা আরবদের আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান শেখাও, তাহলে তারা এসবের পেছনে পড়বে। তখন তারা না থাকবে মুসলমান, না হবে বিজ্ঞানী।" (দ্য প্রটোকল, সূত্র, নয়া দিগন্ত, ২৫ জানুয়ারি ২০১৯।)

ভারত উপমহাদেশে মুসলমানরা আরও মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হয় বৃটিশদের দ্বারা। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মাধ্যমে ব্রিটিশরা ভারতের ভূখণ্ড দখল করে। কিন্তু ভারতীয় উপমহাদেশের জনগণ বিশেষ করে মুসলিমদের সাথে সংঘাত থাকায় তারা স্বাভাবিকভাবে নিজেদের কার্য পরিচালনায় বাধাগ্রস্ত হয়। তাই তারা শুরু করে আইডোলোজিক্যাল এটাক্ট। শিক্ষাব্যবস্থাকে পরিবর্তন করে তারা ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থা চালু করে। উদ্দেশ্য, ভারতে তাদের একনিষ্ঠ কিছু কর্মচারি তৈরি করা এবং সাথে সাথে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব হ্রাস করা। তারা ভারতের মানুষকে ভারতের চিন্তা-চেতনা থেকে সরিয়ে ব্রিটিশ চিন্তা-চেতনায় গড়তে চেয়েছে।

১৮৩৫-এর ২রা ফেব্রুয়ারী ব্রিটিশ সংসদের ভাষণে লর্ড মেকলে বলেন,

We must at present do our best to form a class, who may be interpreters between us and millions whom we govern, -a class of persons Indian inblood and colour, but English in tastes, in opinions, in morals and in intellect.

"বর্তমানে আমাদের সর্বাধিক প্রচেষ্টা হবে, এমন একটি গোষ্ঠী তৈরি করা যারা আমাদের ও আমাদের লক্ষ্য প্রচারে দূত হিসেবে কাজ করতে পারে। এরা রক্ত ও বর্ণে হবে ভারতীয়। কিন্তু মেজায, নৈতিকতা ও বুদ্ধিবৃত্তিতে হবে ইংরেজ।"](Macaulay's Minute on Education, February 2, 1835)

মেকলে তার পিতার নিকট ১৮৩৬ ঈ. লিখিত এক চিঠিতে বলেন,

"আমাদের পরিচালিত ইংরেজী স্কুল দ্রুত গতিতে উন্নতি লাভ করছে। এমনকি বর্তমানে ছাত্র সংকুলান অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এ শিক্ষা হিন্দুদের উপরই সর্বাধিক

প্রভাব ফেলছে। কোনো হিন্দু ইংলিশ পড়ার পর নিজ ধর্মের উপর প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাসী থাকতে পারে না। আমার পূর্ণ বিশ্বাস হলো, যদি আমাদের এ শিক্ষাব্যবস্থা সফল হয় তাহলে বঙ্গদেশে কোনো মূর্তিপূজারী থাকবে না (সবাই পশ্চিমা হয়ে যাবে)। তারা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই এমন হয়ে যাবে। 'মিশনারীদের' কোনো প্রকার প্রচারণা ছাড়াই।"(B. C. Rai History of Indian Education p. 135. সূত্র : দীনী ওয়া আসরী দরসগাহেঁ; মাওলানা খালিদ সাইফুল্লাহ রাহমানী, পৃ. ২৪৫।)

মাওলানা আবদুস সাত্তার সাহেব ব্রিটিশদের এমন অসাধু চিন্তা নিয়ে সুন্দর একটি আলোচনা করেছেন। তার আলোচনার সারসংক্ষেপ এখানে তুলে ধরা সমীচীন মনে হচ্ছে।

তিনি বলেন,

'পাক-ভারতে ইংরেজ শাসনের দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পরও পাশ্চাত্য শিক্ষা সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট বিবরণ পাওয়া যায় না। এ সম্পর্কে সর্বপ্রথম মি. চার্লস গ্রান্টের লিখিত নিবন্ধ পাওয়া যায়। ১৭৯২ হইতে ১৭৯৭ পর্যন্ত এ দীর্ঘ সময় ধরিয়া তিনি উক্ত নিবন্ধ রচনা করেন। তিনি এ রচনায় ভারতীয়দের সম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিয়া তাহাদেরকে বর্বর, ডাকাত, চোর ইত্যাদি আখ্যা দান করেন। অতঃপর এই দেশের অর্ধবর্বর লোকদের মাঝে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের প্রস্তাব পাশ করেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন,

এই শিক্ষা দ্বারা বিশেষত হিন্দুরা বেশী উপকৃত হইবে। প্রথমত আমাদের ধর্মীয় শিক্ষা দ্বারা তাহাদের মাঝে যাত্রা শুরু করিতে হইবে। ছোট ছোট বুকলেট এবং পুস্তিকায় এ সব সন্নিবেশিত আছে। সর্বাগ্রে তাহাদেরকে একত্ববাদের শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে। মানবসভ্যতার সত্যিকার ইতিহাস এবং মাহাত্ম্য সম্পর্কে তাহাদেরকে অবহিত করিতে হইবে। তাহাদের পূর্বেকার সকল মতবাদ নস্যাৎ করিবার জন্য পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে, যাহা যথার্থই মিথ্যা। অতঃপর তাহাদেরকে পবিত্র এবং উত্তম কর্তব্যাদির প্রতি অত্যন্ত আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে ধাবিত করিতে হইবে। পাপ, পূণ্য, শাস্তি এবং পরকাল সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করিতে হইবে। এ ধরণের শিক্ষা যেইখানে শুরু হইবে স্বভাবতই সেইখানে

মূর্তিপূজা, কাঠ এবং মাটির তৈরী প্রতিমার উপাসনা চিরতরে বন্ধ হইয়া যাইবে। (History of english education in india by sayed Mahmud, P-13.)

এই দেশের ধর্মীয় স্বরূপ বিকৃত করিয়া খ্রিস্টধর্ম প্রবর্তন করার জন্য মি. গ্রান্ট যে স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন তাহা কতটুকু বাস্তবে রূপ লাভ করিয়াছে তাহা ১৮৩১ সালে প্রকাশিত শিক্ষা কমিটির রিপোর্ট হতেই প্রতীয়মান হয়।

"হিন্দু কলেজের (রাজা রামমোহন রায়ের কলেজকে হিন্দু কলেজও বলা হইতো) সমৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের প্রতি এই কমিটির বিশেষ দৃষ্টি ছিল। ইহার ফলশ্রুতি যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ আশাতীত। ইংরেজী ভাষা রপ্ত করার পাশাপাশি নৈতিক উন্নতি যথেষ্ট সাধিত হইয়াছে। সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছাত্ররা এবং যথার্থ যোগ্য হিন্দু ছাত্ররা নিজেদের তথাকথিত ধর্মের আবেষ্টনি হইতে মুক্তি পাইবার জন্য অধৈর্য হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা প্রকাশ্যভাবে নিজেদের ধর্মের অসারতা সম্পর্কে মন্তব্য করিতেও দ্বিধা করে না। সম্ভবত পরবর্তী বংশধরদের মাঝে তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মতবাদেরই আরও উৎকর্ষ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হইবে।

এখানেও ইচ্ছাকৃতভাবে মুসলমানদের কোনো উল্লেখ করা হয় নাই। আসলে তাদের অভিযান উভয় জাতির বিরুদ্ধেই ছিল। কিন্তু হিন্দুরা নিজেদের মতবাদ এবং ধর্ম বিশ্বাসে তেমন অটল ছিল না বলিয়া ইংরেজদের মিশন তাহাদের মাঝে বেশী কার্যকরী হয় এবং প্রকাশ্যে বলিবার মত হিন্দুদের সম্পর্কেই তাহাদের কিছু বক্তব্য ছিল। পক্ষান্তরে, মুসলমান তাহাদের মতবাদ এবং ধর্ম বিশ্বাসের বেলায় সম্পূর্ণ আপোষহীন ছিল। এই জন্য মুসলমানদের ব্যাপারে তাহারা অত্যন্ত হুশিয়ার এবং সন্তর্পণে অগ্রসর হইতেছিল। মি. গ্রান্টের এ মিশন তথা ভারতীয়দের প্রতি ইংরেজদের কী অভিসন্ধি ছিল স্যার চার্লস ট্রিভল্যান নামক জনৈক ইংরেজ অফিসারের প্রদত্ত বিবরণে তাহা আরও সুস্পষ্ট হয়। ১৮৫৩ সালে পার্লামেন্টের সব কমিটিতে প্রদত্ত এই বিবরণের অংশবিশেষ নিম্নে দেওয়া হইল:

"দেশের বর্তমান প্রচলন এবং রেওয়াজ অনুযায়ী মুসলমানরা আমাদেরকে অভিশপ্ত কাফির এবং বিধর্মীদের দলভুক্ত মনে করে। যাহারা বলপূর্বক একটি সমৃদ্ধিশালী ইসলামী সাম্রাজ্যের আধিপত্য বিস্তার করিয়া বসিয়াছে এবং প্রচলিত ধর্মীয় বৈষম্য অনুযায়ী হিন্দুরাও আমাদেরকে ম্লেচ্ছ বলিয়া আখ্যায়িত করে। অর্থাৎ ইহাদের সাথে কোনরকম সম্পর্ক রাখা অসমীচীন। এই উভয় জাতি মনে করে

আমরা বলপূর্বক তাহাদের সাম্রাজ্য কাড়িয়া লইয়াছি। তাহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আমরা হরণ করিয়াছি। এমতাবস্থায় ইহাদিগকে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রদানের অর্থ দাঁড়াইবে তাহাদের মানসিকতা সম্পূর্ণ পরিবর্তন করিয়া দেওয়া। যেই সব নবীন যুবক আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা গ্রহণ করিবে পূর্বেকার ধারা অনুযায়ী তাহারা প্রচলিত নিয়মে স্বাধীনতা লাভের চেষ্টার কথা ভুলিয়া যাইবে। অর্থাৎ সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে তাহারা তখন দেশের সকল পর্যায়কে পাশ্চাত্য রঙ্গে রঙ্গিন করিবার জন্য প্রচেষ্টা চালাইবে।

চার্লস ট্রিভলেন পুনরায় বলেন,

আমার মতে যে সব স্কুলে উপযুক্ত শিক্ষার বন্দোবস্ত রহিয়াছে সেগুলিতে প্রচুর আর্থিক সাহায্য করা উচিত। আমার উদ্দেশ্য ইহা নয় যে, এমন দিন কোনো সময়ই আসিবে না যখন সরকারী কলেজসমূহেও খ্রিস্টধর্ম শিক্ষা চালু করা যাইবে। আমার মতে এমন উপয্কতু শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে যেদিকে লোকেরা সহজেই আকৃষ্ট। ইহাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নাই যে, খ্রিস্টধর্মভিত্তিক শিক্ষা ছাড়া কোনো শিক্ষাই পরিপক্ক এবং সুষমপূর্ণ নয়। ভারতের একটি অংশ যখন সুশিক্ষিত হইবে তখন আমাদের উচিত হইবে খ্রিষ্টধর্মের শিক্ষা চালু করা। কিন্তু আমাদেরকে এ ব্যাপারে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। যাহাতে সৈন্যবাহিনীর মাঝে কোনরকম অসন্তোষ না জাগে। কলিকাতা হইতে বিদায় গ্রহণের পূর্বে আমি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণকারী এদেশীয় উচ্চ শিক্ষিত এবং বিশেষ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তিদের একটি তালিকা তৈরি করিয়াছিলাম। এই সব ব্যক্তি হিন্দু কলেজে পড়াশুনা করিত। খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের মূলে ইহাদের প্রচুর সাধনা এবং সহযোগিতা রহিয়াছে। ইহাদিগকে কিভাবে খ্রিষ্টান করিতে হইবে, লোকেরা তাহার কোন ফন্দিই জানে না। আমার তো বিশ্বাস আমাদের পূর্বপুরুষেরা যেমন সকলেই গোত্রবন্দি হইয়া খ্রিস্টান হইয়াছেন এখানকার লোকেরাও দলে দলে খ্রিস্টান হইতে বাধ্য। এই দেশে পরোক্ষভাবে পাদ্রীদের দ্বারা এবং প্রত্যক্ষভাবে বই পুস্তক, পত্র-পত্রিকা এবং ইংরেজদের সাথে আলাপ-আলোচনা ও মেলা-মেশার দ্বারা খ্রিস্টধর্ম প্রবর্তিত হইতে পারে।(History of english education in india by sayed Mahmud, P-69)

এই বিশিষ্ট ইংরেজ নাগরিক দেশের সর্বোচ্চ পরিষদের সদস্য এবং গভর্নরও ছিলেন। তাহার উপরোক্ত মতামতে ধর্মীয় নিরপেক্ষতার জিগির সুস্পষ্ট। কিন্তু অন্যদিকে এই ব্যক্তি খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারের ব্যাপারে কতখানি আশাবাদি, তাহার

বর্ণনা হইতেই অনুমান করা যায় যে, স্কুল-কলেজের ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য কি? তাহাদের ধর্মনিরপেক্ষতার আসল উদ্দেশ্য হইল, স্কুল-কলেজে হিন্দু ধর্ম বা ইসলাম ধর্মের কোন শিক্ষা দেওয়া চলিবে না। বরং সে স্থলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে খ্রিস্টান ধর্মের অনুশীলন চলিবে। এই প্রয়াস ধর্মনিরপেক্ষ নয়, এই কথাও বলা যায় না। এই উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে নতুন শিক্ষা-নীতিতে ধর্মশিক্ষার ব্যাপার উহ্য রহিয়াছে। ফলে শিক্ষার্থীরা নিজ ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ থাকিবে। দ্বিতীয়ত, পুরোনো রীতির শিক্ষায়াতনগুলির দ্বার বন্ধ করিয়া দিবে এবং এই শিক্ষা-নীতির দোষ-ত্রুটি বাহির করিতে শুরু করিবে। ফলে জনসাধারণ এই শিক্ষার বিরোধিতা করিতে শুরু করিবে। কেননা, জনসাধারণ যখন দেখিবে, এই শিক্ষার কোন বাস্তব লাভ নাই তখন স্বাভাবিকভাবেই ইহার প্রতি তাহারা অনীহা প্রদর্শন করিবে। ইহার পরও যে সব ধর্ম উৎসর্গপ্রাণ ইহার স্বপক্ষে সংগ্রাম করিবে তাহাদিগকে নিরস্ত্র করিবার জন্য এই শিক্ষার দোষ ত্রুটি প্রমাণ করিবার জন্য তাহাদের নিজস্ব (স্থানীয়) ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করা হইবে। ইহার পর যুবক শিক্ষানবীশরা নিজেদের ধর্মের প্রতি আরও বীতশ্রদ্ধ হইবে এবং জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে খ্রিস্টধর্মের জালে আকৃষ্ট হইয়া পড়িবে।

তাহাদের এই পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ের সাফল্য সম্পূর্ণ সন্তোষজনক এবং তাহা চতুর্দিকে ডাল-পালা বিস্তার করিতেছে। তাহাদের পরিকল্পনার দ্বিতীয় পর্যায় হচ্ছে, পুরোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক সংস্কার। এ ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টি সর্বাগ্রে আলিয়া মাদরাসার উপর পড়িল। (আলিয়া মাদরাসার ইতিহাস, আবদুস সাত্তার পৃ.৬১-৬৯)

তার এ আশা পূর্ণ হয়েছে। জেমস জে. নোভাক বাংলাদেশসহ উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করে Bangdesh reflection on the water (বাংলাদেশ জলে যার প্রতিবিম্ব) রচনা করেন। এতে তিনি লিখেছেন,

‘বাংলাদেশে ইংরেজি ভাষা-সংস্কৃতির অনেক আচার-প্রথা এমনভাবে ঢুকে গেছে যে তা থেকে বাংলাদেশকে আলাদা করা যাবে না।’(বাংলাদেশ জলে যার প্রতিবিম্ব, পৃ. ১৭২ (বিস্তারিত দেখুন, “ইংরেজমুগ্ধ মন” শিরোনামে আলোচনা ১৬৭-১৭৩))

সংঘাতের মুখে মুসলিমদের আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা

ইসলাম একটি সুদৃঢ় বিশ্বাস ও পূর্ণ জীবনব্যবস্থা। নিজ বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তায় পূর্ণ অটল ও অবিচল। সুতরাং মুসলিম অর্থই হলো সে সকল অনৈসলামিক কাজ থেকে মুক্ত। নিজ জীবন, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র সর্বক্ষেত্রে তাকে ইসলাম নিয়ে আপোষহীন থাকতে হবে।

অন্যদিকে পশ্চিমা ও সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থা মুসলিমদের জীবনকে বিভক্ত করে দিয়েছে। নিছক ব্যক্তিজীবন ছাড়া সর্বক্ষেত্রে তাকে বানিয়ে দিয়েছে অনৈসলামিক চিন্তা-চেতনার ধারক বাহক। শুরু হয়েছে বিশ্বাস ও শিক্ষার সংঘাত। ইউরোপীয় শিক্ষা ব্যবস্থার অধীনে পড়াশোনা করে একজন মুসলিম নিজেই নিজের বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। সংঘাত আর টানাপোড়েনের যাঁতাকলে পিষ্ট হতে থাকে তার চিন্তা ও মন। তার জীবন হয়ে উঠে সংঘাতমুখর।

এভাবেই মুসলিমরা বস্তুবাদী চিন্তার শিকার হয়। বস্তুবাদী শিক্ষানীতি ও ইসলামী শিক্ষানীতি কিভাবে এক হতে পারে? ইসলাম ও জাহিলিয়াত কীভাবে একসাথে বসবাস করতে পারে? অন্ধকার ও আলোর সংমিশ্রণ কীভাবে হতে পারে? কারণ দুটির প্রকৃতি ও চেহারা দু'দিকে। দু'ব্যক্তির চেহারা দু'দিকে থাকলে তাদের পিঠ মিলতে পারে; চেহারা নয়। সুতরাং এ দুয়ের মাঝে সমন্বয় সম্ভব নয়। হয়তো এ প্রান্ত না হয় ঐ প্রান্ত। হয়তো পূর্ব না হয় পশ্চিম।

এ সংঘাত নিছক শাখা-প্রশাখায় নয়; বরং কেন্দ্রের গভীরে। সুতরাং মূল নীতি বা কেন্দ্র অপরিবর্তিত রেখে দু'একটি পাঠ্য বই সংযোজন-বিয়োজন কখনই এর সমাধান নয়। এমনিভাবে নিছক 'ধর্মীয়' শিক্ষা বাধ্যতামূলক করাও স্থায়ী কোনো সমাধান নয়। বরং পরিস্থিতি এমন দাঁড়াবে যে, প্রথম ক্লাসে শিখবে, আল্লাহই আমাদের স্বতন্ত্রভাবে সম্মান দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। আর দ্বিতীয় ক্লাসে পড়বে ডারইউনের বিবর্তনবাদ; মানুষ পশু থেকে জন্ম নিয়েছে। এমনিভাবে এক ক্লাসে পড়বে, আল্লাহ প্রথম মানবকে উন্নত শিক্ষা ও সভ্যতা দিয়ে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন। অন্য ক্লাসে শিখবে, প্রাচীন মানুষ ছিলো শিক্ষা ও সভ্যতাশূন্য। এভাবে সংঘাত আরও ঘনীভূত হবে এবং স্বাভাবিক কারণেই বস্তুর সামনে অহীর দুর্বলতা দৃষ্টিগোচর হবে। আর মৃত্যুবরণ করবে ইসলামী মূল্যবোধ ও নৈতিকতা।

অনেক জরিপের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে, এ ধরনের শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষিত অধিকাংশ ছাত্রদের মাঝে এক ধরনের সংশয় কাজ করে। সংশয় না থাকলেও তারা একধরনের অস্বস্তি বোধ করে। বর্তমান জেনারেল শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের চিন্তা-চেতনা সম্পর্কে লর্ড মেকলের মত করে বলা যায়, এরা নামে মুসলিম হলেও চিন্তায় ইউরোপীয়। তারা ক্রমশই ধর্মহীনতার দিকে ধাবিত হচ্ছে। নতুন এক মানসিকতায় জন্ম নিচ্ছে। বাস্তবায়ন হচ্ছে 'দ্য প্রটোকল'-এর সেই ইহুদী চক্রান্ত। আল্লামা আবুল হাসান নাদাবী রাহ. (১৪২০হি.) এর বাস্তব চিত্র এভাবে তুলে ধরেছেন,

ایك طبقہ ایسا پیدا ہو گیا جو اسلام سے نہ صرف یہ کہ بیگانہ تھا، بلکہ اس کو اس سے ایک طرح کا بعد اور وحشت تھی، ،، ارے بھئی ! اگر کچھ لوگ شراب پیتے ہیں تو پھر اس میں کون سی ایسی مصیبت آئی، اور اگر ٹیلی ویژن پر یہ سب کچھ دکھلایا جاتاہے ، اور اس سے لڑکوں اور لڑکیوں کے اخلاق پر اثر پڑتا ہے او ایسی کیا قیامت آجاتی ہے؟

وہ کھائیں پئیں، دکان اور کاروبار کریں، دولت پیدا کریں، ان کو اس سے کیا تعلق ہے، مذہب تو ایک پرائیویٹ معاملہ ہے،

ان کے استادوں نے اور مغرب کی یونیورسٹیوں نے ان کے دل ودماغ میں یہ بات اتاردی ہے کہ مذہب تو ایک شخصی معاملہ ہے، اور مذہب کی بقا بھی اسی میں ہے کہ شخصی معاملہ رہے

"এমন একটি প্রজন্ম গড়ে উঠেছে যারা শুধু ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ এমন নয়, বরং তারা ইসলাম থেকে দূরত্ব ও ঘৃণ্য মনোভাব রাখত। (ভাবটা এমন) আরে ভাই! কিছু মানুষ শরাবমত্ত হয়ে পড়লে অসুবিধে কোথায়, টেলিভিশনে সবকিছু প্রদর্শিত হলে ছেলে-মেয়েদের চরিত্রে কুপ্রভাব পড়ার কারণে কি কিয়ামত ঘটিত হয়ে যাবে?।

তারা খাওয়া-দাওয়া, ব্যবসা বাণিজ্য করবে, সম্পদ-বৈভবের অধিকারী হবে। ধর্মের সাথে তাদের কী সম্পর্ক? ধর্ম তো নিছক একটি ব্যক্তিগত বিষয়।

তাদের শিক্ষক ও পশ্চিমা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের ব্রেইন ওয়াশ করে এ কথা বদ্ধমূল করে দিয়েছে যে, ধর্ম নিছক একটি ব্যক্তিগত বিষয়। আর ধর্ম টিকে থাকতে হলে ব্যক্তি পর্যায়ে সীমাবদ্ধ হয়েই থাকতে হবে।" (নিযামে তালীম: আবুল হাসান নাদবী রাহ. পৃ. ১৬।)

আজ আমাদের দেশের দিকে তাকালে এর পূর্ণ সত্যতা দেখতে পাই। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বত্র এমন চিন্তাধারী শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবীর অভাব নেই যারা সর্বদা ইসলামের ক্ষেত্রে শিথিল মনোভাব পোষণ করে। আর রক্ষণশীলদেরকে ধর্মান্ধ বলে দোষারূপ করে। এ সংকট থেকে উত্তরণের জন্য আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা তাওফীক দান করুন।

পশ্চিমা শিক্ষাব্যবস্থা: এক প্রকার ঈমানবিধ্বংসী রসায়নিক উপাদান

জাতির উত্থান ও পতনের মূলে শিক্ষা ও শিক্ষাব্যবস্থার বড় ভূমিকা রয়েছে। শিক্ষাব্যবস্থা অনেকটা রসায়নিক উপাদানের মত যা খুব সহজে একটি জাতির চিন্তা-চেতনায় বিক্রিয়া ঘটায়। তাই কোনো জাতির মূলে পরিবর্তন করতে হলে তার শিক্ষাকে পরিবর্তন করতে হবে। এমনিভাবে কোনো জাতিকে বিকলাঙ্গ করতে হলে শিক্ষার মাধ্যমে তাদের চিন্তাকে বিকলাঙ্গ করতে হবে। এই নীতি অনুসরণ করে পশ্চিমারা দ্বান্দ্বিক শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে মুসলিমদেরকে অসার চিন্তা আর চেতনার সংঘাতের দিকে ঠেলে দিয়েছে। পেছনের বিভিন্ন আলোচনায় তা ফুটে উঠেছে।

বিশিষ্ট দার্শনিক কবি মুহাম্মাদ ইকবাল রাহ. (১৯৮৩ঈ.) তাদের এ অপকৌশল স্বচক্ষে দেখে তার জোরালো প্রতিবাদ করেছেন। তিনি মুসলিম উম্মাহর উন্নতির জন্য ইসলামী শিক্ষাবিজ্ঞানকে আবশ্যক সাব্যস্ত করেছেন। তিনি পশ্চিমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে 'তীযাব' বলেছেন, যা স্বর্ণকে মাটিতে পরিণত করে। তিনি বলেন

تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو

ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے ادھر پھیر

تاثیر میں اکسیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب

سو نے کا ہمالہ ہو تو مٹی کا ہے اک ڈھیر

"তার সত্তা ও চিন্তা-চেতনাকে শিক্ষাব্যবস্থা নামক এসিডে সমর্পন করো, তাহলে তা অনুগত হয়ে যাবে এবং তুমি যেকোনো দিকে ফিরাতে পারবে।

প্রভাব ক্রিয়ায় রসায়নকেও ছাড়িয়েছে শিক্ষাব্যবস্থা নামক এ এসিড। যা স্বর্ণের হিমালয় পর্বতকে মাটির টুকরোয় পরিণত করতে পারে।”(নিযামে তালীম: আবুল হাসান নাদবী রাহ. পৃ. ১৮।)

বলাবাহুল্য, এমন ‘তীযাবীয়’ শিক্ষাব্যবস্থার উপর আস্থা রাখা মানেই দেশ ও জাতির নিজস্ব ধর্ম ও সংস্কৃতির বিসর্জন দেয়া। ভারতে যখন স্যার সাইয়্যেদ আহমাদ খান আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্রিটিশদের আদলে ইসলামী শিক্ষা চালু করেছিল তখন তার প্রতিবাদে কবি আকবার ইলাহাবাদীসহ আরও অনেকে এমন মন্তব্য করেছেন এবং আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন যে, তার এ শিক্ষাব্যবস্থা মুসলিম শিক্ষার্থীদেরকে ধর্মহীনতার দিকে ঠেলে দিবে। পরবর্তীতে তা প্রমাণিতও হয়েছে।(বিস্তারিত জানতে দ্র. আফকারে আলম-মাওলানা আসীর আদরাবী ১/৩৬৫-৩৯৭, প্র. শাইখুল হিন্দ একাডেমী, দারুল উলূম দেওবন্দ।)

ড. মুহাম্মদ আসাদ (১৯৯২ঈ.) সুন্দরই বলেছেন,

‘পাশ্চাত্য সভ্যতাই মুসলমানদের স্থবির সভ্যতাকে নবজীবন দান করার মতো একমাত্র শক্তি মনে করে মুসলিমরা যতোদিন সেদিকে তাকিয়ে থাকবে ততোদিন তারা তাদের আত্মবিশ্বাসকে ধ্বংস করবে এবং পরোক্ষভাবে এই পাশ্চাত্য মতবাদকে সমর্থন করে যাবে যে, ইসলাম হচ্ছে একটি ক্ষয়িত শক্তি।’(সংঘাতের মুখে ইসলাম পৃ. ৫৭।)

চিন্তাশীলদের অজানা নয় যে, দ্বান্দ্বিক চিন্তা চেতনা নিয়ে কোনো জাতি উন্নতি করতে পারে না। সংঘাত মানুষকে পতনের দিকে ঠেলে দেয়। এটাই হলো পশ্চিমাদের অপকৌশল। তারা চায় আমরা সংঘাতে থাকি, আর তারা শাসন করুক।

মুসলিমরাই কেন সংঘাতের মুখে?

প্রশ্ন হতে পারে, সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থা প্রাচ্যের হিন্দু ও খ্রিস্টানরাও গ্রহণ করেছে, তারা কেন সংঘাতে নিপতিত হলো না। আমরাই কেন সংঘাতের থেকে গেলাম?

অনেকে এভাবে কৌতূহল প্রকাশ করে থাকেন। এ কৌতুহলের মূল কারণ হলো, বিষয়টিকে গভীর থেকে না ভাবা এবং ইসলাম ও ইউরোপের স্বভাব ও প্রকৃতির পার্থক্য চিন্তায় অনুপস্থিত থাকা। প্রকৃত কথা হলো, প্রচলিত খ্রিস্টবাদে দীন ও দুনিয়ার মাঝে কোনো সংঘাত নেই। তাদের দৃষ্টিতে দুটির রাজত্বই ভিন্নভাবে একসাথে চলতে পারে। তাদের বাইবেলে উল্লেখ করা হয়েছে,

Give to the emperor the things that are the emperor's, and to God the things that are God's.

'যা সম্রাটের তা সম্রাটকে দাও, আর যা ঈশ্বরের তা ঈশ্বরকে দাও। (বাইবেল-নতুন নিয়ম; মথি লিখিত সুসমাচার; ২২: ২১।)

ইসলাম ব্যতীত অন্যান্য ধর্মের অবস্থা প্রায় এমনই। তাই এদের সাথে পাশ্চাত্য সভ্যতার কঠিন কোনো সংঘাত পরিলক্ষিত হয় না। শিক্ষা দর্শনে স্বীকৃত ব্যক্তিত্ব আল্লামা আবুল হাসান আলী নাদাবী রাহ. (১৪২০হি.) সুন্দরই বলেছেন। তিনি বলেন,

بات یہ ہے کہ جو فلسفہ تعلیم ان غیر اسلامی ممالک میں آیا ، وہاں کے اقدار اور بنیادی عقائد سے متصادم نہیں تھا، ان اقدار میں اول تو جان نہیں تھی، جان تھی بھی تو ان میں ہر نئے فلسفے کو قبول کرنے کی صلاحیت تھی ، ان کی تو بیناد ہی مستحکم نہیں، بہت سیال ورقیق قسم کی چیزیں ہیں

مثلا میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ جب جواہر لال صاحب سے پوچھا گیا کہ ہندو کی کیا تعریف ہے؟ تو انھوں نے بہت سوچنے کے بعد کہا کہ جو اپنے کو ہندو کہے وہ ہندو ہے،

ہمارے ایک دوست نے واقعہ سنایا، وہ محکمہ تعلیم کے آدمی تھے، کہ ہم لوگ اسٹاف روم میں بیٹھے ہو ئے تھے، میں نے اپنے ایک ہندو پروفیسر دوست سے کہا:پروفیسر صاحب، ہم سے اگر پوچھا جا ئے کہ دولفظوں میں اسلام کا خلاصہ بیان کردو تو ہم کہیں گے: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان رکھنا ہے، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ دو لفظوں میں آپ ہندوئیت کی تعریف کردیجئےتو آپ کیا کہیں گے؟

اور دیکھئے گہرے فلسفے کی ضرورت نہیں ہے، میری لا ئبریری میں بہت سی کتابیں ہیں، میں پڑھ لوں گا، آپ تو اس وقت دو لفظوں میں بتادیجئے کہ اگر مچھ سے ہی کوئی پوچھے کہ ہندو کسے کہتے ہیں اور اس کی کیا تعریف ہے، تو میں کیا جواب دوں؟

نہیں کرتا وہ بھی Believe تھوڑی سوچتے رہے، کہنے لگے : اصل بات یہ ہے کہ جو کسی چیز میں کرتاہے وہ بھی ہندو ہے Believe ہندو ہے، اور جو ہر چیز میں

تو ان کا نظام عقائد اگر ہے تو وہ اتنا روادار ہے کہ ہر فلسفہ کاساتھ دے سکتاہے، اس کا کوئی ٹکراؤ نہیں، اس لئے فرض کیجیے کہ مغرب کا نظام تعلیم جب ہندوستان میں آیا تو اس نے ہندو سوسائٹی میں کوئی بے چینی پیدا نہیں کی، کچھ پرانے لوگ تھے جو کہتے تھے کہ سمندر کا سفر نہیں کرسکتے ، صبح کا نہانا ضروری ہے، اس کے بغیر کھانا نہیں کھا سکتے، اس کے اندر کیا جان ہے؟

تھوڑے دنوں کے اندر معلوم ہوگیا کہ ہم نے بے سوچے سمجھے باتیں قبول کرلی تھی، یہ موجودہ تمدن کے ساتھ نہیں چل سکتیں،

لیکن اصل مسئلہ پیش آیا ہمارے مسلم معاشرہ کو، وہاں توحید کا ایک مفہوم ہے، اس کے متعین حدود ہیں، کہ یہاں تک ایمان ہے، اس کے بعد کفر کی سرحد شروع ہوجاتی ہے،

ایک وقت میں آدمی کئی مذاہب کا وفادار نہیں ہو سکتا، بیک وقت آدمی توحید وشرک کو جمع نہیں کرسکتا، اور یہ خیال کہ مغرب سب کچھ ہے، اور وہی قیادت کا اہل ہے، پھر اس کے بعد رسول اکرم کو دائمی و عالمی رہنما اور معیار ماننا...

“কথা হল, অনৈসলামিক রাষ্ট্রগুলোতে যে শিক্ষাদর্শন এসেছে তা সেখানকার মূল্যবোধ এবং মৌলিক চিন্তাধারার সাথে সাংঘর্ষিক ছিল না।

প্রথমত, তাদের নিজস্ব মূল্যবোধের মাঝে কোনো প্রাণই ছিল না। আর থাকলেও তাদের মাঝে নিত্য-নতুন দর্শন গ্রহণের প্রবণতা ছিল। তাদের ভিত্তিমূলই ছিল নড়বড়ে। অনেকটা ভাসমান ও ঢিলা প্রকৃতির। উদাহরণস্বরূপ আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেই জওহার লাল সাহেবের কথা। যখন তাকে ‘হিন্দুর’ পরিচয় জিজ্ঞাসা করা হল, অনেক ভেবে-চিন্তে উত্তর দিলেন, ‘যে নিজেকে হিন্দু বলে সেই হিন্দু।’

আমার এক বন্ধু একটি ঘটনা শুনালেন। তিনি ছিলেন শিক্ষামন্ত্রণালয়ের একজন সদস্য। বললেন, ‘একবার আমরা স্টাফরুমে বসা ছিলাম। আমি এক হিন্দু প্রফেসর বন্ধুকে বললাম, প্রফেসর সাহেব! আমাদেরকে দু’ শব্দে ইসলামের পরিচয় জিজ্ঞাসা করা হলে বলব, লা ইলাহা ইল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’। এখন যদি আপনাকে এরূপ সংক্ষিপ্তাকারে হিন্দু ধর্মের পরিচয় জিজ্ঞেস করা হয় তখন আপনি কী বলবেন?

দেখুন, এখানে দর্শনগভীরতা নিস্প্রয়োজন। আমার লাইব্রেরীতে অনেক কিতাব রয়েছে। আমি পড়ে নিব। এখন আপনি শুধু এটুকু বলুন, আমাকে কেউ দু’বাক্যে হিন্দু ধর্মের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে কী বলব?

কিছুক্ষণ চিন্তা-ফিকির করে বললেন, আসল কথা হলো, যে কোনো কিছুতে বিশ্বাসী নয় সেও হিন্দু; আবার যে সব কিছুতে বিশ্বাস স্থাপন করে সেও হিন্দু!

তো যদি তাদের বিশ্বাস থেকেই থাকে তাহলে তা এতই নমনীয় যে, যেকোনো দর্শনের সঙ্গ দিতে পারে। কোনো প্রকারের সংঘর্ষ ছাড়াই। তাই দেখুন, যখন হিন্দুস্তানে পশ্চিমা শিক্ষাব্যবস্থা আরোপিত হলো তখন তা হিন্দু সমাজের মাঝে কোনো অস্থিরতা সৃষ্টি করেনি। কিছু সনাতন লোকেরা বলত, সমুদ্র ভ্রমণ করা যাবে না। প্রত্যুষে স্নান করতে হবে। স্নান ব্যতিত আহার নেই। আর এসব ছিলো নিস্প্রাণ। কিছুদিন পর ধরা পড়ল, আমরা বোধহীন হয়ে তাদের অনুসরণ করে চলছি। এ সবকিছু বর্তমান সভ্যতার সামনে টিকবে না।

কিন্তু সমস্যা সৃষ্টি হলো আমাদের মুসলিম সমাজে। আমাদের তাওহীদের মর্মই একটি। তার রয়েছে নির্ধারিত সীমারেখা। এ পর্যন্ত ঈমান, আর তা অতিক্রম করলেই সূচনা হয় কুফরের।

একই সময়ে মানুষ একাধিক ধর্মাবলম্বি হতে পারে না। একত্ববাদ ও অংশীবাদ একই সাথে গ্রহণ করা যায় না। আর এ চিন্তাও একসাথে পোষণ করা যায় না যে, পশ্চিমারাই হবে সবকিছু, তারাই নেতৃত্বের যোগ্য, আবার সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও বৈশ্বিক ও চিরন্তন রাহবার হিসেবে গ্রহণ করা।" (নিযামে তালীম পৃ.১৩-১৪।)

ব্রিটিশ-ভারত এবং স্বাধীন ভারত ও বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা

ব্রিটিশ ভারতে শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে পিছনে কিছু আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে এ কথা ফুটে উঠেছে যে, তারা ভারতের মানুষকে ধর্মান্তরিত করা এবং তাদের ভক্ত ও ভীতু বানানোর জন্য ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা পরিবর্তন করেছিল। মুসলমানরা তাদের এ শিক্ষাব্যবস্থা গ্রহণ না করলেও হিন্দুরা সাদরে গ্রহণ করে। ভারতে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় তাদের সেক্যুলার ও মিশনারী শিক্ষাব্যবস্থা ব্যাপকতা লাভ করে। অন্যদিকে মুসলিমরা ছিলো শিক্ষাক্ষেত্রে নানা সংঘাতে আক্রান্ত। মুসলমানদের মাঝে যারা ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তারা ক্রমে ভয়াবহ পরিণতির শিকার হয়েছে। যেমনটি ইতোপূর্বে উল্লেখ হয়েছে। মাওলানা মানাযির

আহসান গীলানী রাহ. (১৩৭৫হি.) এর বক্তব্যেও এর সুদূরপ্রসারী ক্ষতির দিক উঠে এসেছে,

ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت کے برخاست ہوجانے کے بعد حکومۃ مسلطۃ نے تعلیم کا جو نظام ملک میں (اسکولوں اور کالجوں وغیرہ) کے نام سے قائم کیا، مشاہدہ بتا رہاہے کہ اس نظام کی تعلیم سے استفادہ کرنے والے مسلمانوں میں بتدریج اسلامی زندگی سے بعد پیدا ہوتا چلا جارہاہے، یہ واقعہ ہے کہ جن خاندانوں نے جدید تعلیم تیسری اور چوتھی پشت میں اسوقت تک پہنچ چکی ہے، ان میں اسلام کا صرف نام رہ گیا ہے، عام ابتدائی باتیں بھی ان لوگوں کو اسلام کے معلوم نہیں، یہ سنی ہوئی نہیں دیکھی ہوئی بات ہے۔

“ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনক্ষমতা হারানোর পর ক্ষমতাধর ব্রিটিশরা স্কুল ও কলেজের নামে এ দেশে যে শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেছে, বাস্তবতায় দেখা যাচ্ছে, এ শিক্ষাধারী মুসলমানরা ক্রমান্বয়ে ইসলামী জীবনব্যবস্থা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। বাস্তবতা হলো, এ নব্য শিক্ষাধারীদের তৃতীয় চতুর্থ প্রজন্ম এমন হয়েছে, তারা শুধু নামসর্বস্ব মুসলিম আছে। ইসলামের প্রাথমিক সাধারণ বিষয়গুলো সম্পর্কেও অজ্ঞ। এটি শ্রুতকাহিনী নয়; প্রত্যক্ষদর্শিত বাস্তবতা।” (হিন্দুস্তান মেঁ মুসলামনূঁ কা নেযামে তালীম ওয়া তারবিয়াত-মাওলানা মানাযির আহসান গীলানী রাহ. ২/৪০১ প্র. মাকতাবাতুল হক, মুম্বাই।)

অবশেষে ১৯৪৭ সনে ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। কিন্তু শিক্ষা-ব্যবস্থায় মৌলিক কোনো পরিবর্তন হয়নি। তাই স্বাধীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থাও মুসলিমদের অনুকূল ছিলো না। যার দরুন ভারতের চিন্তাবিদ উলামায়ে কিরাম মূল শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে বিভিন্নভাবে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

১৯৭১ সনে আমাদের দেশ স্বাধীন হলো। জাতিকে নব চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ করার জন্য শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কার করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৭২ সালে ড. কুদরত-ই-খুদার নেতৃত্বে ১৯ সদস্যের বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন নামে একটি কমিশন গঠিত হয়। ১৯৭৩ সালে কমিশনের সদস্যবৃন্দ ভারত সফর করেন। কমিশনের সদস্যগণ একমাস ব্যাপী ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। ১৯৭৪ সালে এ কমিশন সরকারের কাছে চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করে।

ড. কুদরত-ই-খুদার কমিশন গড়ে উঠেছিলো সেক্যুলার ও সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায়। এ কমিশনে ধর্মীয় শিক্ষার গুরুত্ব কতটুকু ছিলো তা এ ধারা থেকেই বোঝা যায়- 'প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ধর্মশিক্ষা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করা হবে।' (অধ্যায় ৭.১০)। পরবর্তীতে ধর্মীয় শিক্ষাকে সংযোজন করলেও মূল ভাবধারা পূর্বেরটিই বাকী থাকে। যা থেকে আমরা এখনো বের হতে পারিনি। ফলে এখনও আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা দ্বান্দ্বিক ও দ্বিমুখী হয়ে আছে।নর্জাগরণের প্রচেষ্টা]

ভারত উপমহাদেশে শিক্ষাব্যবস্থা ইসলামীকরণের প্রয়াস

মুসলমানদের এ পতন থামানোর জন্য প্রয়োজন ছিলো স্বতন্ত্র ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মাদরাসা। যেখানে ইসলামী উলূম তথা উলূমে নাকলিয়া ও আকলিয়া ইসলামী ব্যবস্থাপনায় শিক্ষা দেয়া হবে। বৈরী পরিবেশে ব্যাপক কাজ করার সুযোগ না থাকায় হযরত কাসেম নানুতভী রাহ. ইসলামের উলুমে নাকলিয়ার জন্য ১৮৫৭ সালে দারুল উলুম দেওবন্দ নামে স্বতন্ত্র মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন।

দারুল উলূমের মাধ্যমে সম্পূর্ণ ইসলামী ভাবধারায় উলূমে নাকলিয়ার শিক্ষাদানের সূচনা হয়। আল্লাহ তাআলার মেহেরবানীতে এতে অভূতপূর্ব কামিয়াবী অর্জিত হয়। এই দারুল উলূমের মাধ্যমেই মূলত ভারত উপমহাদেশে কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা প্রাচ্যবিদদের ষড়যন্ত্র থেকে বেঁচে যায়। অন্যথায় এখানেও ইসলাম ধর্মের শিক্ষা হতো প্রাচ্যবিদদের ভাবধারায়, এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালিত হতো তাদের চিন্তা-চেতনার অনুকরণে। যেমনটি হচ্ছে কোনো কোনো মুসলিম দেশে। বর্তমানে ইউরোপ ও আমেরিকাতেও ইসলাম ধর্ম পড়ানো হয়। । অনেক ইউনিভার্সিটিতে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে স্বতন্ত্র অনুষদও রয়েছে; তবে তা সম্পূর্ণ প্রাচ্যবিদদের নীতি ও ফর্মুলার আলোকে।(দারুল উলূম দেওবন্দের এ প্রচেষ্টা জারী না থাকলে হিন্দুস্তানের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিণতি বাগদাদের মতই হয়ে যেত। মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী হাফি. বাগদাদের মাদারিস সম্পর্কে বলেন, 'আমি বাগদাদে গিয়েছিলাম। বাগদাদ একটি ঐতিহ্যবাহী মুসলিম নগর। বহু শতাব্দী এ নগর ছিলো মুসলিম জাহানের রাজধানী। আব্বাসী খেলাফতের শান-শওকত এ জগৎ এককালে সেখানে প্রত্যক্ষ করেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় একদার সরগরম সেই মহানগরে যখন আমি পৌঁছাই, বড় কৌতূহল জাগলো

কোনো মাদরাসা সম্পর্কে জানার ও তা পরিদর্শন করার। জিজ্ঞেস করালাম, এখানে কোনো মাদরাসা আছে? এমন কোনো দীনী প্রতিষ্ঠান আছে যেখানে ইলমে দীনের তালীম হয়? যদি থাকে আমি সেখানে যেতে চাই।

উত্তর পাওয়া গেল, এখানে এ রকম কোনো মাদরাসার নাম-নিশানাও নেই। যা ছিলো সবই স্কুল-কলেজে রুপান্তরিত হয়ে গেছে। দীন শেখার জন্য এখানকার ইউনিভার্সিটিগুলোতে ইসলামী ফ্যাকাল্টি আছে। তাতে ধর্ম শিক্ষা দেয়া হয় বটে কিন্তু তার সূরতহাল বড় বেদনাদায়ক। শিক্ষকদেরকে দেখলে তাদেরকে আলেম বলে অনুমান করা কঠিন। বরং সন্দেহ জাগে, তারা আদৌ মুসলিম কি না? সেসব ফ্যাকাল্টিতেও সহশিক্ষাই চলছে। ছেলে-মেয়েরা একত্রে মিলেমিশে পড়াশুনা করছে। তাতে ইসলাম কেবল একটা মতবাদ হিসেবেই টিকে আছে। কেবল ঐতিহাসিক দর্শন হিসেবে তা পড়ানো হয়। জীবনপ্রণালীতে তার কোনো আসর দেখা যায় না। ওরিয়ান্টলিস্টদের লেখাপড়ার সাথে তাদের কোনও পার্থক্য নেই। আজ আমেরিকা, কানাডা ও ইউরোপের ইউনিভার্সিটিগুলোতেও ইসলামী শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। ইসলামের বিভিন্ন বিষয় তাতে পড়ানো হয়। কুরআন, হাদীস, ফিকহ ইত্যাদির তালীম দেয়ার ব্যবস্থা আছে। ...

পাশ্চাত্যের ওসব শিক্ষাকেন্দ্রে শরঈ কলেজ ও উসূলুদ দীনের কলেজও আছে। কিন্তু তার শিক্ষার্থীদের জীবনে সে শিক্ষার কোনো আসর নযরে আসে না। বস্তুত তাতে যা আছে, তা শিক্ষার খোলসমাত্র। কিছুমাত্র সারবস্তু নেই। ইলমে দীনের রূহ থেকে তা সম্পূর্ণ বঞ্চিত। (ইসলাম ও আমাদের জীবন ১৩/৫২-৫৩ প্র. মাকতাবাতুল আশরাফ)

দারুল উলূমের প্রতিষ্ঠাতা হযরত কাসেম নানুতুবী রাহ.-এর ইচ্ছা ছিলো, ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি মুসলমানদের প্রণয়নকৃত দর্শন ও বিজ্ঞানের মৌলিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা। সে ইচ্ছাকে সামনে রেখে একটি শিক্ষা সিলেবাস প্রণয়ন করা হয়। তিনি ১৯ যী'কাদা ১২৯০হি. মোতাবেক ৯ জানুয়ারি ১৮৭৪ ঈ. সনদ ও পুরষ্কার বিতরণী মাহফিলে দারুল উলূম দেওবন্দের পাঠ্যক্রম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সিলেবাসবিষয়ক উত্থাপিত নানা প্রশ্নের জবাব দেন। সে বক্তব্যে তিনি বলেন,

علوم نقلیہ، اور ان کے ساتھ علوم دانش مندی کو داخل تحصیل کیا۔

[উলূমে আকলিয়ার সাথে দর্শন ও যুক্তিবিদ্যাকে পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।](সাওয়ানেহে কাসেমী: মাওলানা মানাযির আহসান গীলানী ২/২৭৫, ২৮১ মাকতাবা দারুল উলূম, দেওবন্দ।)

দারুল উলুমের প্রাথমিক পর্যায়ে দর্শন ও বিজ্ঞান চর্চার নমুনা কেমন ছিলো তা এক ব্রিটিশ পরিদর্শকের রিপোর্টে উঠে এসেছে। তিনি ১৮৭৫ সালে গভর্নরের পক্ষ থেকে দেওবন্দ মাদরাসার শিক্ষা কারিকুলাম ও শিক্ষার উদ্দেশ্য বিষয়ে রিপোর্ট করার দায়িত্বরত ছিলেন। তিনি দারুল উলূম দেওবন্দ পরিদর্শন করে বলেন,

یہاں سے آگے بڑھا تو ایک جگہ صاحب میانہ قد نہایت خوب صورت بیٹھے ہوئے تھے، سامنے بڑی عمر کے طلبہ کی ایک قطار تھی، قریب پہنچ کر سنا تو علم مثلث کی بحث ہو رہی تھی، میرا خیال تھا مجھے اجنبی سمجھ کر یہ لوگ چونکیں گے، لیکن کسی نے مطلق توجہ نہ دی، میں قریب جاکر بیٹھ گیا اور ا سننے لگا، میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی، جب میں نے دیکھا کہ علم مثلث کے ایسے ایسے عجیب اور مشکل قاعدے بیان ہورہے تھے، جو میں نے کبھی ڈاکٹر اسپرنگر سے بھی نہیں سنے تھے،

یہاں سے اٹھ کر میں دوسرے دالان میں گیا تو دیکھا ایک مولوی صاحب کے سامنے طالب علم معمولی کپڑے پہنے بیٹھے ہوئے، یہاں اقلیدس کے چھٹے مقالے کی دوسری شکل کے اختلافات بیان ہورہے تھے اور مولوی صاحب اس بر جستگی سے بیان کررہے تھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا اقلیدس کی روح ان میں آگئی ہے، میں منہ تکتارہ گیا، اسی دوران میں مولوی صاحب نے جبر ومقابلہ ٹاڈہنٹر سے مساوات درجہ اول کا ایک ایسا مشکل سوال طلبہ سے پوچھا کہ مجھے بھی اپنی حساب دانی پر پسینہ آگیا ، اور میں حیران رہ گیا، بعض طلبہ نے جواب صحیح نکالا ---

یہاں سے میں ایک زینے پر چڑھ کر دوسری منزل میں پہنچا،،،

میری تحقیقات کے نتائج یہ ہیں کہ یہاں کےلوگ تعلیم یافتہ، نیک چلن اور نہایت سلیم الطبع ہیں، اور کوئی ضروری فن ایسا نہیں جو یہاں پڑھیا نہ جاتا ہو---

[একটু সামনে এগিয়ে দেখলাম মধ্যগঠনের সুদর্শন এক লোক বসা। সম্মুখে বড় বয়সী ছাত্রদের একটি সারি। কাছে গিয়ে দেখি ত্রিকোণমিতির আলোচনা চলছে। মনে করেছিলাম বিদেশী হিসেবে আমাকে দেখে তারা চমকে যাবে। কিন্তু না; কেউ আমার দিকে দৃষ্টিপাতও করল না। আমি কাছে গিয়ে বসলাম। উস্তাযের তাকরীর শুনছিলাম। বিস্ময় আর আশ্চর্যে আমার চক্ষু চড়কগাছ! ত্রিকোণমিতির এমন কিছু

দুর্বোধ্য, সুক্ষাতিসুক্ষ সূত্রের আলোচনা করছিলেন যা আমি ডাক্তার স্প্রিঙ্গার থেকেও শুনিনি!

এখান থেকে উঠে দ্বিতীয় ভবনে গেলাম। সেখানে একজন মৌলভী সাহেবের সামনে সাদাসিধে পরিধেয়ধারী কিছু ছাত্রকে দেখলাম। উকলীদাসের (ইউক্লিডের) ৬ষ্ঠ মাকালার শাকল-এর বাদ-মতবাদ আলোচনা হচ্ছিল। মৌলভী সাহেব অনর্গল তাকরীর করে যাচ্ছিলেন। মনে হচ্ছে উকলীদাসের প্রাণ তার মাঝে সঞ্চার হয়েছে! বিস্ময়ে আমি বাকরুদ্ধ হয়ে পড়লাম। মৌলভী সাহেব বীজগণিতের এমন একটি একটি কঠিন প্রশ্ন ছাত্রদেরকে করলেন যার হিসাব কষতে গিয়ে আমি ঘর্মাক্ত হয়ে উঠলাম। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লাম। তবে কোনো কোনো ছাত্র এর সঠিক উত্তর প্রদান করেছে।

ওখান থেকে বিদায় নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে আরেক ভবনে গেলাম। ...

আমার পরিভ্রমণ ও পর্যবেক্ষণের ফলাফল হলো, এখানকার সবাই শিক্ষিত। সৎ চরিত্রবান। উত্তম স্বভাবের। প্রয়োজনীয় শাস্ত্রের সবগুলো এখানে পঠিত হয়।] (আর-রশীদ; তারীখে দারুল উলূমে নাম্বার, দীনি মাদারিস: ইবনুল হাসান আব্বাসী পৃ ৫৪-৫৯ প্র. মাকতাবা উমর ফারূক, করাচী।)

দারুল উলূমে দর্শন ও বিজ্ঞানের কিছু বই সিলেবাসে থাকলেও মৌলিক উদ্দেশ্য ছিলো, উলূমে নাকলিয়া তথা কুরআন ও হাদীসের ইলম। ইলম ও জ্ঞানের প্রতিটি শাখা এমন বিস্তৃত যে, একই সাথে উলূমে নাকলিয়া ও আকলিয়া অর্জন করা প্রায় অসম্ভব। তাই এ ধারা পরবর্তী সময়ে ব্যাপকভাবে বহাল থাকেনি। উলূমে নাকলিয়াকে প্রাধান্য দিয়েই শিক্ষাক্রম চালু থাকে এবং এক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সফলতাও অর্জিত হয়। এই চিন্তায় উজ্জীবিত হয়ে বাংলাদেশে হাজারও মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এসব মাদরাসার আলিম-তালিবে ইলমগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করে ইসলামী শিক্ষা ও গবেষণার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

শিক্ষাব্যবস্থা ইসলামীকরণের এ ধারাটি সফল হলেও তা উলূমে নাকলিয়ার মাঝে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে। তাই ইসলামী উলুমে আকলিয়া ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্য প্রয়োজন ছিলো স্বতন্ত্র এক প্রতিষ্ঠান। এই লক্ষ্যে উলামায়ে দেওবন্দসহ

অন্যান্য ইসলামী চিন্তাবিদ মিলে প্রতিষ্ঠা করেন জামিআ মিল্লিয়াসহ আরও কিছু জামিআ।

কাজ শুরু হলো; কিন্তু সফলতা অর্জিত হলো না। এর পিছনে বিভিন্ন কারণ কার্যকর ছিলো। তবে অন্যতম কারণ হলো, জামিআর কারিকুলাম ও পরিবেশ ইসলামীকরণ না করা। তাই যে স্বপ্নকে নিয়ে জামিআ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো তা অর্জিত হয়নি। সংশ্লিষ্টরাই তা স্বীকার করেছেন। এ থেকে আমাদের সহজেই বোঝা উচিত, ইসলামী নাম দিলেই ইসলামী হয় না। বরং শিক্ষাব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন অনিবার্য প্রয়োজন।

[মক্কা ঘোষণা ও শিক্ষাব্যবস্থাকে ইসলামীকরণে ও. আই. সির প্রয়াস]

আলহামদুলিল্লাহ, মুসলমানদের প্রচেষ্টা থেমে থাকেনি। শিক্ষার এ সংকট নিয়ে সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক সেমিনার হয় মক্কায় ১৯৭৭ সালে। Conference Of Islamic Education সেমিনারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে,

إن كل نظام تعليمي يحمل في طياته فلسفة معينة منبثقة من تصور معين، ولا يمكن فصل أي نظام تعليمي عن فلسفته المصاحبة له، ومن ثم فإنه لا يجوز أن تتخذ فلسفة أو سياسة تعليمية وتربوية مبنية على تصور مغاير للتصور الإسلامي، وهو ما يحدث الآن حين الأخذ بالنظم غير الإسلامية، لأنها في النهاية تصادم التصور الإسلامي وتناقضه، وفي الوقت ذاته فإن للإسلام تصورا عاما شاملا تبنثق منه فلسفة تعليمية وتربوية قائمة بذاتها ومتميزة عن غيرها.

لذا فإن نظام التعليم الإسلامي يجب أن يقوم على أساس هذا التصور الخاص المتميز، أما الوسائل فلا ضير من الاستفادة منها في التجارب البشرية الناجحة، ما دامت لا تصادم هذا التصور ولا تناقضه.

[প্রতিটি শিক্ষাব্যবস্থাই নির্দিষ্ট চিন্তা-চেতনায় উজ্জীবিত একটি দর্শনে লালিত। অবিচ্ছিন্ন সেই দর্শন থেকে তাকে পৃথক করা সম্ভব নয়। আর তাই মুসলিমদের ইসলামী চেতনা বিরোধী ধ্যান-ধারণায় লালিত কোন দর্শন, কিংবা শিক্ষানীতি গ্রহণ করা যাবে না, যা পরিলক্ষিত হচ্ছে বর্তমান অনৈসলামিক শিক্ষানীতি গ্রহণের কারণে। কারণ তা শেষ ফলে ইসলামী চিন্তা-চেতনার সাংঘর্ষিক। অথচ ইসলামের ব্যাপক ও ব্যাপ্তিময় চিন্তা-চেতনা রয়েছে, যা থেকে একটি প্রতিষ্ঠিত ও স্বতন্ত্র শিক্ষা ও নৈতিক দর্শন জন্ম লাভ করতে পারে।

আর তাই ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা এ স্বতন্ত্র চেতনাকে কেন্দ্র করেই গ—ে ওঠতে হবে। হাঁ, শিক্ষামাধ্যমগুলো ইসলামবিরোধী না হওয়ার শর্তে সফল ও কার্যকরী অভিজ্ঞতায় গ্রহণযোগ্য হলে তা দ্বারা উপকৃত হতে কোন বাঁধা নেই।] (http://www.habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/4698, Memorandum Of the first world conference on muslim education at hotel intercontinental, macca, march 31 - april 8, 1977)

এই সেমিনার থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে অনেক জামিআ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শিক্ষাব্যবস্থা ইসলামীকরণ বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষাও হয়েছে। এর মাঝে অন্যতম হলো মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরের International Islamic University। (Islamization Of Knowledge . By. D. Abdul Hamid Ahmad p.19। (জ্ঞানের ইসলামায়ন: আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়া মডেল-ড. আবদুল হামিদ আহমদ আবু সোলাইমান পৃ. ১৯))

এ প্রক্রিয়া আরো জোরদার করতে ঙ ও ঈ কর্তৃক ১৯৮১ সালে মক্কা শরীফে অনুষ্ঠিত তৃতীয় কনফারেন্সে এ বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে উপস্থাপন করা হয়। সেখানে বাংলাদেশসহ মুসলিমপ্রধান দেশের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রণ করেন। সে সেমিনারে বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, যা 'মক্কা ঘোষণা' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এর মাঝে শিক্ষা বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তা নিম্নে তুলে ধরা হলো।

৬. Believing the tenets of Islam which preach that the quest of knowledge is an obligation on all Muslims we declare ourselves determined to cooperate in spreading education more widely and strengthening educational institutions until ignorance and illiteracy have been eradicated and to take measures aimed towards the strengthening of Islamic educational curricula and to encourage research and Ijtihad among Muslim thinkers and Ulema while expanding the studies of modern sciences and technologies.

We also pledge ourselves to coordinate our efforts in the field of education and culture, so that we may draw on our religious and traditional sources in order to unite the Ummah consolidate its culture and strengthen its solidarity, cleanse our societies of the manifestations of moral laxity and deviation by inculcating moral virtues, protecting our youth from ignorance and from exploitation of the material needs of some Muslims to alienate them from their religion.

Believing in the need to propagate the principles of Islam and the spread of its culture, glory throughout the Islamic societies and in the world as a whole and to emphasize its rich heritage, its spiritual strength, moral values and laws conducive to progress, justice and prosperity, we are determined to cooperate to provide the human and material means to achieve these objectives. We also pledge to exert further efforts in various cultural fields to achieve rapprochement in the thinking of Muslims and to purify Islamic thought of all that may be alien or divisive.

We further pledge ourselves, within a framework of cooperation and a joint program to develop our mass-media and information institutions, guided in this effort by the precepts and teachings of Islam, in order to ensure that these media and institutions will have an effective role in reforming society, in a manner that helps in the establishment of an international information order characterized by justice, impartiality and morality, so that our nation may be able to show to the world its true qualities, and refute the systematic media campaigns aimed at isolating, misleading, slandering and defaming our nation.

[জ্ঞানের অনুসন্ধান প্রতিটি মুসলমানের জন্য একান্ত কর্তব্য - ইসলামের এই নীতির প্রতি বিশ্বাস রেখে আমরা এই প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করছি যে, অজ্ঞানতা ও নিরক্ষরতার দূরীকরণ না করা পর্যন্ত আমরা শিক্ষার ব্যাপক বিস্তারের ক্ষেত্রে পরস্পর সহযোগী হব; ইসলামী শিক্ষা কারিকুলামকে শক্তিশালী করব এবং মুসলিম চিন্তাবিদ ও আলেমদের ইজতিহাদ ও গবেষণাকে উৎসাহিত করব। সাথে সাথে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও টেকনোলজির গবেষণাকে প্রসারিত করব।

আমরা আমাদের এই প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করছি যে, আমরা শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আমাদের প্রচেষ্টাকে সমন্বয় করব, যাতে আমরা আমাদের ধর্ম ও ঐতিহ্যের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে উম্মাহ্কে ঐক্যবদ্ধ করতে পারি; উম্মাহ্র সংস্কৃতিকে সংহত করতে পারি; আমাদের জাতি ও সমাজকে সব ধরনের অবক্ষয় ও বিপথগামিতা থেকে পবিত্র এবং নৈতিক গুণাবলী ও মূল্যবোধে সমৃদ্ধ করতে পারি; আমাদের যুব সমাজকে মূর্খতা ও ইসলামবিরোধী চিন্তাধারা থেকে হেফাজত করতে পারি এবং অর্থনৈতিক অসচ্ছলতার সুযোগ নিয়ে মুসলমানদেরকে ধর্মচ্যুত করার প্রকল্পসমূহ থেকে উম্মাহকে হেফাজত করতে পারি।

ইসলামের নীতি, আদর্শ এবং সংস্কৃতিক বিকিরণ ইসলামী সমাজ এবং গোটা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দেয়ার প্রয়োজনীয়তা আমরা গভীরভাবে বিশ্বাস করি। কারণ, এর দ্বারা ইসলামী নীতিতে যে আধ্যাত্মিক শক্তি, নৈতিক মূল্যবোধ এবং উন্নতি ও সমৃদ্ধির চালিকাশক্তি রয়েছে তা প্রকাশ পাবে। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমরা বৈষয়িক উপায়-উপকরণ ও জনসম্পদ সরবরাহের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। চলমান ইসলামী চিন্তার অঙ্গন থেকে যাবতীয় বিজাতীয় ও বিভেদমূলক চিন্তার উচ্ছেদের মাধ্যমে একে পবিত্রকরণ এবং সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুসলমানদের চিন্তাগত ঐক্য সৃষ্টির জন্য অধিক প্রচেষ্টা ব্যয়ের প্রতিশ্রুতিও আমরা ঘোষণা করছি।

আমরা এ ব্যাপারেও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে, ইসলামের শিক্ষা ও মডেলকে সামনে রেখে আমাদের প্রচার-মাধ্যমসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে উন্নয়নের জন্য যৌথ কর্মসূচী ও পরিকল্পনার মাধ্যমে কাজ করব। যাতে করে এসব মাধ্যম সমাজ সংস্কারে কার্যকর ভূমিকা রাখে এবং একটি পক্ষপাতহীন, নীতিনিষ্ঠ ও

সুবিচারমূলক আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম ব্যবস্থা গড়ে উঠে। এর দ্বারা উম্মাহ্র পক্ষে তার বাস্তব অবস্থান ও চিত্র ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হবে। মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিভ্রান্তিকর প্রচারণা ও তাদের ওপর সামগ্রিক অবরোধ সৃষ্টির এজেন্ডাধারী মিডিয়াকে প্রতিহত করা সম্ভব হবে। (http://www.oic-oci.org/english/conf/is/3/3rd-is-sum)

এ ঘোষণায় শিক্ষা-সংক্রান্ত একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ফুটে উঠেছে। এর মাঝে অন্যতম হলো, শিক্ষাব্যবস্থাকে ইসলামীকরণ ও শক্তিশালীকরণ। শিক্ষাঙ্গন ও শিক্ষা কারিকুলাম থেকে যাবতীয় বিজাতীয় ও বিভেদমূলক চিন্তা উচ্ছেদকরণ।

শিক্ষার বিষয়ে আমাদের যেকোনো চিন্তা করার পূর্বে এই দুটি দিক নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে হবে। এ দু'দিকে আমরা সফলতা অর্জন করতে পারলেই অন্যান্য ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করতে পারব। ইনশাআল্লাহ।

সর্বোপরি শিক্ষাকে ইসলামীকরণ একটি স্বীকৃত বাস্তবতা। ইসলামী বিশ্বে একটি বহুল আলোচিত বিষয়। আরববিশ্বসহ মালয়েশিয়া ও পাকিস্তানে এর পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক প্রচুর কাজ চলছে। তবে জামিআতুল কারাবীয়্যিনের সেই আদর্শ চিত্র এখনো প্রস্ফুটিত হয়নি।

[সর্বাত্মক ও প্রাণান্তকর চেষ্টা ব্যতীত শিক্ষাব্যবস্থা ইসলামীকরণ সম্ভব নয়]

শিক্ষাব্যবস্থা ইসলামীকরণ একটি স্বীকৃত বাস্তবতা। শিক্ষা নিয়ে যারা সামগ্রিক চিন্তা করেন তারা এর গুরুত্ব অকপটে স্বীকার করেন। এ কাজে সাধারণত দু'ধরনের মানসিকতা প্রতিবন্ধক হয়ে থাকে।

প্রথম. ইউরোপপ্রীতি

ইউরোপ অনুসরণকে নিজেদের সফলতা ও কামিয়াবীর চাবিকাঠি মনে করা। বড় বৈচিত্রময় এদের মানসিকতা। একদিকে তারা জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী। অন্যদিকে চিন্তা-চেতনায় ভিন্ন জাতির অনুকরণে বদ্ধপরিকর! এমন প্রবণতা কোনো জাতির জন্যই কল্যাণকর নয়। বিশেষ করে মুসলিম জাতির জন্য তো নয়ই!

সর্বদা আমাদের হযরত ওমর রা. এর অমর বাণী স্মরণ রাখতে হবে। তিনি বলেছেন,

إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله

[আমরা ছিলাম সর্বনিকৃষ্ট জাতি। অতঃপর আল্লাহ তাআলা ইসলামের মাধ্যমে আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন। সুতরাং যখনই আমরা ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো মাধ্যমে সম্মানের পিছনে ছুটব তখনই আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে অপদস্থ করবেন।] (মুসতাদরাক আলাস-সহীহাইন; হাকেম আবু আবদুল্লাহ নীশাপুরী রাহ. হাদীস নং ২০৭।)

মুসলিমদের প্রতি ইউরোপদের বিদ্বেষ প্রমাণিত হওয়ার পরও তাদের অনুসরণ করার মানসিকতা কোনোভাবেই যৌক্তিক হতে পারে না।

এছাড়া শিক্ষানীতি ভিন্ন দেশ থেকে আমদানী করা খোদ ইউরোপ বিরোধী কাজ। কারণ, ইউরোপের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা বিষয়ক নীতি হলো, নিজেদের মতাদর্শের আলোকে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা এবং ভিন্ন দেশ বা ভিন্ন মতাদর্শ প্রভাবিত শিক্ষানীতি আমদানী না করা, যেমনটি আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

সুতরাং আমাদের উন্নতি আমাদের মত করেই হতে হবে। আমাদের শরীরে আমাদের পোশাকই মানাবে, অন্যদেরটি নয়। তবে এর অর্থ এ নয় যে, আমরা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে।

ড. মুহাম্মাদ আসাদের ভাষায় বলতে গেলে, "মুসলিমদের পাশ্চাত্য শিক্ষার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের অর্থ মোটেই এ নয় যে, ইসলাম- শিক্ষার বিরোধী। আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের এই অভিযোগের ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক কোনো ভিত্তি নেই।...

ইতিহাস সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণ করে যে, ইসলাম যেমন বিজ্ঞানে অগ্রগতির প্রেরণা দিয়েছে, অপর কোনো ধর্ম কখনো তা দেয়নি। শিক্ষা, বিজ্ঞান ও গবেষণা ইসলামী ধর্মশাস্ত্র থেকে যে প্রবল উৎসাহ পেয়েছে, তার ফলে উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসনামলে এবং স্পেনে আরব শাসনের যুগে গৌরবদীপ্ত সাংস্কৃতিক কৃতিত্ব অর্জন সম্ভব হয়েছিলো।

এ তথ্য ইউরোপের ভালভাবেই জানা উচিত। কারণ, বহু অন্ধকার শতাব্দীর পর প্রাপ্ত রেনেসাঁর চাইতে ইসলামের কাছে তার নিজস্ব সংস্কৃতি কম ঋণী নয়।"(সংঘাতের মুখে ইসলাম পৃ. ৫৯, ৬০-৬১)

দ্বিতীয়. হীনমন্যতা ও ভীতি

অনেকেই আছে যারা এ বাস্তবতাকে স্বীকার করে। তবে জটিল ও কষ্টসাধ্য হওয়ায় উদ্যোগ নিতে ভয় পায়। আমাদের মনে রাখতে হবে, কোনো জাতির উত্থান ও উৎকর্ষের অন্তরায় হলো ভীতি ও হীনমন্যতা। সে জাতির পতন অনিবার্য যে জাতির কর্ণধার উদ্যোগ নিতে ভয় পায়। আমাদের অগ্রসর হতেই হবে, রাস্তা যত কঠিন হোক। পৃথিবীতে সর্বাত্মক ত্যাগ ছাড়া কোনো বিপ্লব সফল হয়নি। আরামে বসে নিজের রুজি-রুটির চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকলে সফল উত্থান ও উৎকর্ষ অসম্ভবই মনে হবে। তবে যারা প্রকৃত অর্থেই ইসলামী জাগরণ চায়, তাদের কাছে কোনো কিছুই অন্তরায় নয়।

আল্লামা আবুল হাসান নাদাবী রাহ. (১৪২০হি.) সুন্দর বলেছেন,

وحل هذه المشكلة مهما تعقد وطال واحتاج إلى الصبر والمثابرة ليس إلا أن يصاغ هذا النظام التعليمي صوغا جديدا، ويلائم بعقائد الأمة المسلمة ومقومات حياتها وأهدافها وحاجاتها، ويخرج من جميع مواده روح المادية والتمرد على الله والثورة على القيم الخلقية والروحية، وتعبد الجسم والمادة، وينفخ فيه روح التقوى والإنابة إلى الله، وتقدير الآخرة، والعطف على الإنسانية كلها، فمن اللغة والآداب إلى الفلسفة، وعلم النفس، ومن العلوم العمرانية إلى علوم الاقتصاد والسياسة لا تسيطر على كل ذلك إلا روح واحدة، يقصي استيلاء الغرب العقلي ويكفر بإمامته وسياسته، وتجعل علومه ونظرياته موضوع الفحص والدراسة الجريئة، ويوضح ماذا جنى تفوذ الغرب وسيطرته على الإنسانية والمدنية، وتدرس علومه بشجاعة وحرية، وتعتبر كمواد خامة نصنع منه ما يوافق حاجاتنا ورغباتنا وعقيدتنا وثقافتنا.

إن هذا العمل ولو كانت في طريقه عقبات وعراقيل، ولو تأخرت نتائجه، ولكنه حل وحيد للموجة الطاغية التي قد اكتسحت العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه، موجة التجدد والتغرب التي تتحدى الكيان الفكري للإسلام وجهازه الاجتماعي، وظلت تهدد حياته وبقائه.

هذا التغيير الجذري لنظام التعليم وتكوينه الإسلامي أمر لا غنى عنه، ولكنه يحتاج إلى وقت طويل، ويحتاج ... إلى مواهب ومؤهلات عظيمة، وسائل كثيرة

[এই সংকট থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ হলো, শিক্ষাব্যবস্থার নবরূপায়ন। তা যতই সুকঠিন ও কষ্টসাধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী হোক না কেন। যা মুসলিম জাতির মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস, জীবনীশক্তি, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং প্রয়োজনসমূহের উপযোগী হবে।

সম্পূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থাকে বস্তুবাদী ধ্যান-ধারণা, খোদাদ্রোহিতা, আত্মিক ও চারিত্রিক মুল্যবোধ বিরোধী আচরণ এবং প্রবৃত্তিপূজা ইত্যাদি থেকে মুক্ত করবে।

খোদাভীতি, আল্লাহমুখিতা, আখিরাতকে প্রাধান্য দান, এবং সর্বোপরি মানবতাবোধের ঝোঁক-প্রবণতার মূলধারা ছড়িয়ে দিবে।

ভাষা-সাহিত্য থেকে শুরু করে দর্শন, মনোবিজ্ঞান, ভূগোল, এবং বিজ্ঞান থেকে অর্থনীতি, রাজনীতি, তথা সর্বত্র একই আত্মাশক্তির বিচরণ থাকবে।

বুদ্ধিবৃত্তিক পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবকে মিটিয়ে তাদের নেতৃত্বকে অস্বীকার করবে। তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গিকে গবেষণা ও অধ্যয়নসাপেক্ষ বিবেচনা করবে। স্পষ্ট করে তুলে ধরবে, মানবতা ও সমাজের উপর পাশ্চাত্য কী কুপ্রভাব ও ক্ষতি করেছে। তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে পূর্ণ সাহসিকতা ও স্বাধীনতার সাথে অধ্যয়ন করা হবে। তাদের গবেষণাকে অপরিপক্ক বিবেচনা করে আমাদের আকীদা, সংস্কৃতি ও প্রয়োজন মাফিক রূপায়ন করব।

এ কাজটির বাস্তবায়ন যত দুরুহ ও কষ্টসাধ্য, সময়সাপেক্ষ হোক, এটিই একমাত্র সমাধান মুসলিম বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের নেতৃত্বদানকারী তাগুতি শক্তিকে রুখে দাঁড়ানোর। এই অপশক্তিটি ইসলামী চেতনা, মূল্যবোধকে চ্যালেঞ্জ ছু—ে আসছে এমনকি ইসলামের জীবন-মরণের হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।...

শিক্ষাব্যবস্থার এই মৌলিক পরিবর্তন ও ইসলামায়ন অতি আবশ্যক একটি বিষয়। যদিও তা দীর্ঘ সময়, প্রতিভাধারী যোগ্য ব্যক্তি ও উপায়- উপকরণসাপেক্ষ।](নাহওয়াত তারবিয়াতিল ইসলামিয়্যা (نحو التربية الإسلامية): সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নাদাবী পৃ. ৪১-৪৫, দ্র. আছছিরা' বাইনাল ফিকরাতিল ইসলামিয়্যাহ ওয়াল ফিকরাতিল গারবিয়্যাহ পৃ.১৭৭-১৯১।)